ক্ষুদ্র অর্থায়নের ডিজিটাল যাত্রা

সংখ্যা-৩১ • বর্ষ-৯

প্রত্যয়
ডিসেম্বর ২০২৩ • সংখ্যা-৩১ • বর্ষ-৯

উপদেষ্টা সম্পাদক
জাকির হোসেন

সম্পাদকমণ্ডলী
প্রাণেশ চন্দ্র বণিক
ফারমিনা হোসেন

সম্পাদক
ফেরদৌস সালাম

নির্বাহী সম্পাদক
বিদ্যুত খোশনবীশ

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
শাহ আবুল কালাম আজাদ

যোগাযোগ
khoshnobish@burobd.org
01318 230552
01977 220550

www.prottoybd.com

বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক
বাড়ি-১২/এ, ব্লক-সিইএন (এফ),
সড়ক-১০৪, গুলশান-২,
ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০০ টাকা

সম্পাদকীয়

ডিএফএস ▮ এগুচ্ছে বাংলাদেশ

যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থের যোগানের সাথে বেশি প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। একটি দেশের মোট জনসংখ্যার সবাই জনশক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় না কিংবা তারা জনসম্পদও নয়। জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যা নিয়ম সংবলিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ এমনিতেই জনসংখ্যা আধিক্য একটি দেশ, তদুপরি দক্ষ জনশক্তির প্রবল অভাব রয়েছে। ফলে এ দেশ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে এখনও বঞ্চিত। দেশে তৃণমূল পর্যায়ে এখনও অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের শিকার। আশার কথা, স্বাধীনতা মুহূর্তেও দেশের দারিদ্র্যের হার ছিল প্রায় ৮০%, সেখানে এই হার ২০% এর নিচে নেমে এসেছে। এর পেছনে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও দারিদ্র্য নিরসনের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, বেসরকারি খাতের শিল্পায়ন এবং জনশক্তি রপ্তানি খাতের ভূমিকার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এনজিও ও এমএফআইদের ব্যাপক ভূমিকা ও অবদান রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য অর্থনৈতিক অঙ্গনে চালু হয়েছে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস– ডিএফএস। গত জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ১৮ কোটির বেশি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৩ কোটির বেশি। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, দেশে ৯৭.৪% পরিবার মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এদের মধ্যে ৬০% এর বেশি পরিবার ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রয়োজন অনুভব করে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এই সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে যে, দেশের ৫২ শতাংশেরও বেশি মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সব স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই ডিএফএসের আওতায় অর্থ লেনদেন করেন না।

তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নয়ন ধারায় ইন্টারনেট সংযোগকৃত একটি স্মার্টফোনের সঠিক ব্যবহার ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধিসহ তার কর্মক্ষমতা, কর্মদক্ষতা ও নতুন ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করতে সহায়ক। জেন্ডারভিত্তিক তুলনায় ৭৩ শতাংশ নারী ও ৬৭ শতাংশ পুরুষ বলেছেন, তাদের কর্মজীবন ও দক্ষতা বিকাশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ধারার সাথে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতে দেশের এনজিও/এমএফআই সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করছে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ পরিবার। একসময় যারা ছিল নিরক্ষর, দরিদ্র ও অসহায়, দেশ ও সমাজ সম্পর্কে যাদের তেমন কোনো ধারণা ছিল না, সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি থেকে ছিল যথেষ্ট পিছিয়ে, ছিল অসচেতন, সেই তারাই আজ স্মার্টফোনের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় অর্জন করেছে দক্ষতা। তারা জানে, কীভাবে লেনদেন করতে হয়। কীভাবে মেসেজ পাঠাতে হয়। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশকে স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। দেশ ধীরে ধীরে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুতে পারছে, তেমনই ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যাংকিং হিসাববহির্ভূত মানুষদের লেনদেনের সুযোগ এনে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডিএফএসের এই সেবা ব্যাংকের চেয়েও অধিক সেবামনস্ক।

বুরো বাংলাদেশসহ উন্নয়ন খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে যাচ্ছে। এতে করে তৃণমূল পর্যায়ে গড়ে উঠছে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। আশা করা যায় ২০৩৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারকে ডিএফএসের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

এ সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখা ও ছবি দিয়ে কমিউনিকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সদস্যরা সার্বিক সহযোগিতা করেছেন– প্রত্যয় এর পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দেশের মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে ডিজিটালাইজেশনের প্রথম উদ্যোগটি গ্রহণ করেছিল বুরো বাংলাদেশ। প্রযুক্তির বৈশ্বিক বিকাশের সাথে মিথস্ক্রিয়া ধরে রাখা, ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি ও কর্মীর দক্ষতা উন্নয়নের অপরিহার্যতা অনুভব করেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্যোগ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি ও বুরো বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি এবং একই সাথে দেশের এমএফআই সেক্টরের ডিজিটাল যাত্রাকেও অনুপ্রাণিত করেছে। প্রত্যয়ের এই সংখ্যার মাধ্যমে আমরা বুরো বাংলাদেশসহ এমএফআই সেক্টরের ডিজিটাল অগ্রযাত্রা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা দিতে পারব বলে মনে করি।

ফারমিনা হোসেন
পরিচালক অপারেশনস
ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস
এইচআরডি ও আইসিটি

ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি

জাকির হোসেন

গ্লোবাল ইকোনমির এই সময়ে দেশ 'ক্যাশলেস' আর্থিক লেনদেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাড়ছে ডিজিটালাইজেশন ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। নিশ্চিত হচ্ছে দেশের উন্নয়ন ধারা। এটি বাস্তব যে, ডিজিটালাইজেশন হচ্ছে যুগের দাবি। বর্তমান বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এটি জরুরি। এটি কাজকে সহজ করে দেয়, সাপোর্টগুলোতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদিকে সহজ করে দেয়। এটি ঠিক যে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি। কারণ, যে দেশ প্রযুক্তিতে যত বেশি এগিয়ে এবং যত বেশি দক্ষ জনশক্তির অধিকারী সেই দেশের অর্থনীতি তত বেশি সমৃদ্ধ। প্রসঙ্গত যদি জাপানের কথা ধরা হয় তবে বলবো যে জাপান মুহূর্তেই প্রযুক্তিতে এত বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এ জন্য তাদের দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে। সেই ১৯৫৮ সাল থেকেই জাপানে নিম্ন মাধ্যমিক লেভেলে প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক প্রযুক্তি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের বাস্তবিক অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে হাতে-কলমে শেখানো যাতে করে ছাত্ররা তাদের সেই জ্ঞান দ্বারা আধুনিক মেশিন তৈরি এবং চালনা করার মাধ্যমে স্বকর্মে উজ্জীবিত হতে পারে। এভাবেই সেখানে একজন ছাত্র একদিকে যেমন আত্মকর্মসংস্থান কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে তেমনি তার কর্মধারায় আধুনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনসহ দৈনন্দিন জীবনের অর্থাৎ তার মধ্যে পেশার উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়া দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, সেখানে শুধু ছাত্রদের জন্য স্কুল নয়, অভিজ্ঞ শিক্ষক গড়তে তিন বছর মেয়াদি প্রযুক্তি শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়। কারণ, ছাত্রদের প্রযুক্তির ধারায় শিক্ষিত করতে প্রথমেই প্রয়োজন প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং এ ধরনের একটি

> "একটা সময় ছিল যখন প্রযুক্তির দিক থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল কিন্তু এখন বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির ছোঁয়া বেশ সাবলীলভাবেই পড়েছে। আমরা ডিজিটাল ফাইন্যান্সের যুগে পদার্পণ করেছি।

শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া উচিত সে জন্য পাঠ্যক্রম বিশেষজ্ঞদের যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয় প্রযুক্তি শিক্ষার বিষয় জানতে।

জাপানে ১৯৮০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্সের প্রচলন করা হয়। আবার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আছে Mechatronics কোর্স যা Mechanics এবং Electronics এর সমন্বয়ে গঠিত। এভাবেই জাপানে শিক্ষাব্যবস্থা কার্যক্রম সংস্কার করে তা সময়োপযোগী করা হয়েছে। আর শুধু বইপত্র অধ্যয়ন জ্ঞান দিয়েই তাদের শিক্ষা প্রদান করা হয় না, বরং হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই যন্ত্র তৈরি থেকে শুরু করে, চালনা এবং নানা সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করতে পারে। জাপান এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমেই প্রযুক্তিতে এত উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কারিগরি শিক্ষাসহ কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট এবং জনসংখ্যার দিক থেকে অনেক বিশাল। বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করছে ঠিক, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কর্মহীন বেকারে পরিণত করছে। বাস্তবভিত্তিক কর্মদক্ষতা না থাকায় এসব ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা নিলেও সেই জ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মোপযোগী হয় না। অথচ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কোর্স যেমন কম্পিউটার স্পেশালিস্ট, ওয়েব ডেভেলপার, অটোমেশন কন্ট্রোল, মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন, অর্গানাইজেশনাল স্কিল, মেইনস্ট্রিম ইত্যাদি কোর্স জানা থাকলে পেশাজীবনে তা কাজে লাগে। এছাড়া একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জনের পরও দেখা যায়, মাতৃভাষা বাংলার বাইরে প্রয়োজনীয় ভাষা না জানা থাকায় বিদেশে কিংবা দেশেই উন্নত ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, জাপানিজ, স্প্যানিশ, রাশিয়ান, আরবি, উর্দু, হিন্দি ভাষা শিক্ষার কোর্স রয়েছে। দেশের বাইরে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা একজন শিক্ষিত তরুণের জন্য অনেক সহায়ক হতে পারে।

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতেও দেশে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ জনশক্তির ব্যাপক প্রয়োজন। বর্তমান

সরকারের ডিজিটাল ভিশন এবং উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা পরিষদের 'ডিজিটাল রূপান্তর ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক গবেষণাপত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। স্বাধীনতার অর্ধশতকে এসে বাংলাদেশ একটা উন্নততর অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। ধীরে ধীরে হলেও এই উন্নয়নের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দেশে বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে ব্যাংকিং, নন ব্যাংকিং আর্থিক খাতে ডিজিটাল কার্যক্রমের ধারা সংযোজিত হচ্ছে। একইভাবে বেসরকারি উন্নয়ন খাতেও এর প্রচলন শুরু হয়েছে। শাখাবিহীন ব্যাংকিংয়ের প্রসারের মাধ্যমে ডিজিটাল আর্থিক অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে বাংলাদেশ। প্রযুক্তিগত এই পদ্ধতি দেশের ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী ধারা সৃষ্টি করেছে। এর মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনপদের মানুষের দোরগোড়ায় পূর্ণ পরিষেবা খুচরা ব্যাংকিং পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) এখন গ্রাহক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এই সুবিধার আওতায় এসেছে। এই প্রক্রিয়ার সাথে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো শুরু থেকেই জড়িত। বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসা রেমিট্যান্সগুলো এবং কৃষিঋণের একটা বিরাট অংশ তারা সরাসরি কিংবা মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে উপকারভোগীকে পৌঁছে দিয়ে থাকে। মূলত ডিজিটাল ফাইন্যান্স হলো আর্থিক পরিষেবা শিল্পে নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা করতে ব্যবহৃত শব্দ। এতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য, অ্যাপ্লিকেশন, প্রক্রিয়া এবং ব্যবসায়িক মডেল রয়েছে যা ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ঐতিহ্যগত উপায়ে রূপান্তরিত করেছে। এই পরিষেবা গ্রহণের জন্য বা এর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য কাউকে ব্যাংকে যেতে হয় না। ঘরে বসেই এই সেবা পাওয়া যায়। এককথায় বলা যায় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অর্থাৎ এমএফএসের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা এখন হাতের মুঠোয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজনে অন্য একজন ব্যক্তি যিনি অন্য স্থানে অবস্থান করেন তাকে কিছু টাকা পাঠাবেন– সেক্ষেত্রে আগে দুজন ব্যক্তিকেই ব্যাংকে যেতে হতো, ক্ষেত্রবিশেষে দুজনকেই ব্যাংক গ্রাহক হতে হতো। কিন্তু এখন আর তার প্রয়োজন পড়ে না। একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তার মোবাইলে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে জমা করে মুহূর্তে তা প্রেরকের মোবাইলে পাঠিয়ে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, ঘরে বসেই এখন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে বিভিন্ন বিল পরিশোধ, নিজ ব্যাংক হিসাব থেকে অন্য হিসাবে টাকা হস্তান্তর করা যায়। বর্তমানে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট (এমএফআই) মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে। তারা তাদের লাখ লাখ গ্রাহকের লেনদেন এই এমএফএসের মাধ্যমে করছে। এতে লেনদেনে যেমন স্বচ্ছতা চলে এসেছে, তেমনি বাড়তি খরচ করে কারও সংশ্লিষ্ট শাখায় যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না।

একটা সময় ছিল যখন প্রযুক্তির দিক থেকে বাংলাদেশ যথেষ্ট পিছিয়ে ছিল কিন্তু এখন বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির ছোঁয়া বেশ সাবলীলভাবেই পড়েছে। আমরা ডিজিটাল ফাইন্যান্সের যুগে পদার্পণ করেছি। আগেই বলেছি ডিজিটাল ফাইন্যান্স হলো আর্থিক পরিষেবা এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিংয়ে নতুন প্রযুক্তির একীকরণ প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলোকে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে এবং আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলো অনলাইন পরিচালনা করতে সক্ষম করে। অর্থাৎ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) বিভিন্ন আর্থিক প্রযুক্তি বা ফিনটেককে অন্তর্ভুক্ত করে যার মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল ওয়ালেট, মোবাইল ব্যাংকিং অনলাইন পেমেন্ট, রোবো, অ্যাডভাইজার এবং আরও অনেক কিছু। যেকোনো ব্যাংক হিসাবের ই-ওয়ালেটের মাধ্যমে ক্যাশলেসভাবে Transaction, Bill Pay, Recharge, Add Money, Statement, E-Statement, Bank Deposit, Cards, Tap and Pay, Send Money, Inbox, Live Chat ইত্যাদি মুহূর্তেই করা যাচ্ছে–এটি নিঃসন্দেহে আধুনিকায়নের সর্বোচ্চ ধাপ বলা যায়। ব্যাংকের e-wallet এ আরও রয়েছে ব্যাংক ব্যালেন্স দেখার সুযোগসহ E-Bank, Bill Pay, Recharge, Send Money, Cards, DPS & FDR, BEFTN, Remittance, Binimoy, NPSBসহ বিভিন্ন সার্ভিস। ২৪ ঘণ্টাই করা যায় লেনদেন।

পণ্ডিত চাণক্য বলেছেন, যারা দক্ষ এবং পরিশ্রমী তাদের কাছে কোনো কিছু জয় করা অসাধ্য নয়। শিক্ষিত কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো দেশই বিদেশ নয়। একটি প্রবাদ আছে– দক্ষতা হলো একটি তালার চাবির মতো। এটি ছাড়া হাজার বার চেষ্টা করেও সফলতার তালা খুলবে না। দক্ষতা কোনো জ্ঞান নয়, জ্ঞানকে দশ হাজার বার গুণ করলে দক্ষতা হয়।

> **ডিজিটাল ফাইন্যান্স হলো আর্থিক পরিষেবা এবং ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিংয়ে নতুন প্রযুক্তির একীকরণ প্রক্রিয়া। এটি ব্যক্তি এবং ব্যবসাগুলোকে আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতে এবং আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলো অনলাইন পরিচালনা করতে সক্ষম করে।**

দক্ষিণ এশিয়ার ওপর আইএমএফ একটি বই প্রকাশ করেছে। এতে ডিজিটাল লেনদেনে কীভাবে জেন্ডার সমতা বাড়ানো যায় এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কি হতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। জি-২০ দেশের সাথে দক্ষিণ এশিয়ার লেনদেনের পার্থক্যও দেখানো হয়েছে এ বইয়ে। জি-২০ দেশের লেনদেন যেখানে ৫০-৬০ শতাংশ সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার লেনদেন মাত্র ১০ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে যদি এই হার ৫০%-৬০% করা যায় তবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ বাড়বে, জিডিপি বাড়বে এবং দারিদ্র্য বিমোচনেও ইতিবাচক ভূমিকা নিশ্চিত হবে।

ক্যাশবিহীন লেনদেনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোভিড মহামারি মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের ৫০ লাখ পরিবারকে ২,৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করেছেন মোবাইল ফোনের আর্থিক সার্ভিসের মাধ্যমে। বুরো বাংলাদেশসহ এনজিও/এমএফআই খাতের কার্যক্রমেও এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। লকডাউন মুহূর্তে বুরো বাংলাদেশসহ অনেক এমএফআই তাদের কর্মীদের বেতন-ভাতা, বোনাসসহ আর্থিক সুবিধাদি এমএফএসের মাধ্যমে প্রধান করেছে। বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির অর্থ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রদান হয়ে আসছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে। একথা ঠিক যে, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিটি নাগরিকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অতি আবশ্যক।

বাংলাদেশ এখন ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথে হাঁটছে। বর্তমানে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ৬৫ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছে। মোবাইল ফোনের আর্থিক সেবায় ইতিমধ্যে ৯০ হাজার কোটি টাকার লেনদেন ছাড়িয়ে গেছে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ছোট-বড় পণ্য কেনাবেচার জন্য এখন আর সরাসরি ভোক্তা বিক্রেতার উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না, ডিজিটালাইজেশন তা করা যায়। এ কথা নিশ্চিত যে, সবাইকে যখন ডিজিটাল লেনদেনের আওতায় আনা যাবে, তখন আর ক্যাশ আউটের প্রয়োজন হবে না। একই সাথে সবাইকে ডিজিটাল লেনদেনের আওতায় আনা হলে আর্থিক খাতের দুর্নীতিও অনেক হ্রাস পাবে– এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। দেশের উন্নয়নের গতিও তখন

এখনকার চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। আর এই পুরো কার্যক্রমকে সমন্বিত করতেই প্রয়োজন প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি। উল্লেখ্য, বুরো বাংলাদেশসহ বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অনেক প্রতিষ্ঠানই এ ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করছে। আরেকটি কথা ভুলে গেলে চলবে না, আমরা যেসব জনপদ ও জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করছি, সেখানে ব্যাংকের সেবা এখনও চাহিদা অনুযায়ী পৌঁছেনি। ফলে আমাদের মাইক্রো ফাইন্যান্সের অর্থায়ন সেবা দেশের উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। এখন এই সেক্টরে টেকনোলজির ব্যবহার দেশকে একশ বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। উন্নয়ন ধারার প্রযুক্তিনির্ভর এই ক্যাশলেস লেনদেনকে নিরাপদ করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ডিজিটাল পেমেন্টের সমস্যার সমাধান যেমন জরুরি তেমনি এর পরিধি আরও বাড়ানো প্রয়োজন। যেহেতু এই সিস্টেমটি মোবাইল টু মোবাইলের মাধ্যমে পরিচালিত সেক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি গ্রহণের তথ্য ও আর্থিক সুরক্ষা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ক্ষেত্রে তদারকি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা দরকার। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে এ দেশে ইন্টারনেট সেবার ব্যয় অনেক বেশি তা কমানোর উদ্যোগ নিতে হবে। মোবাইল অপারেটরদের ক্যাশ আউট চার্জ কমানোর বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী এবং ইতিমধ্যে নারীরাও বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়েও বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত এখন। সেক্ষেত্রে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সেবায় নারীর অংশগ্রহণ ও নারী এজেন্টের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রাহকদের সিআইবি প্রতিবেদন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল লোন ও অন্যান্য সেবা গ্রহণের সুবিধা সহজতর করতে হবে। সেই সাথে গ্রাহকদেরও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। তা হলে তাদের পক্ষেও জীবনযাপনের অনেক কাজ সহজভাবে করা সম্ভব হবে। এটা হবে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের আরও একটি বড় সাফল্য।

ডিজিটাল লেনদেনে যাওয়ার একটা বড় সুবিধা হচ্ছে এতে সব লেনদেনের ইলেকট্রনিক রেকর্ড থাকে। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছতে সক্ষম হবে যা নিশ্চিত করে বলা যায়। ডিজিটালাইজেশনের ফলে ভুলের পরিমাণ বেশ কমে যাচ্ছে। মানুষ মাত্রই ভুল করে– আমরা কাজের বেলায় এ কথা অনেকবারই বলি– তা উঠে যাবে। কারণ প্রযুক্তির কাজ নির্ভুল হয়। এ জন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থাসহ জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের এ ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রদানে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এর বাস্তবায়ন হলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি। ■

● প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক
বুরো বাংলাদেশ

মো. আলমগীর
নির্বাহী পরিচালক
অপকা

ডিজিটালাইজেশন আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মবলয় উভয়কেই সহজ করে দিয়েছে। একসময় আমরা যখন ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলাম ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে তখন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বেশ জটিলতা ছিল। কাজ সম্পাদন হয়েও যেন হতে চাইত না। যেহেতু টাকা-পয়সার লেনদেন হিসাব মেলানো বেশ জটিল হতো।
ডিজিটালাইজেশনের ফলে দ্রুত কাজ হয়। সহজে রিপোর্ট তৈরি করা যায়। এতে কর্মীদেরও অনেক কাজ কমেছে। এই পদ্ধতিতে কাজে স্বচ্ছতা থাকে, আর্থিক অনিয়মের আশঙ্কা কম হয়। নির্ভুলভাবে কাজ সম্পাদন করা যায়। এছাড়া কেন্দ্র থেকে শাখা পর্যায় পর্যন্ত কাজের একটা দ্রুত সংযোগ সৃষ্টি হয়, মনিটরিং করা সহজ হয়। ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতরা স্পষ্ট জানতে পারেন সার্বিক অবস্থা। আগে কর্মীদের ম্যানুয়ালি কাজে অধিক সময় দিতে হতো, এখন তারা মাঠ পর্যায়ে গ্রাহকদের অধিক সেবা দিতে পারছে। আরেকটি বিষয় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয়, সেটি হচ্ছে রিপোর্ট তৈরি ও পাঠানো। আমাদের পিকেএসএফকে প্রতি মাসেই রিপোর্ট দিতে হয়– আগে এটি তৈরিতে বেশ কষ্ট হতো, এখন বোতামের এক টিপেই তা তৈরি ও পাঠানো যায়। একই সাথে কর্মীদের কাজের মূল্যায়ন, পারফরমেন্স কেমন ইত্যাদি জানা যায়। ফলে সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়।
মোট কথা ডিজিটালাইজেশন আমাদের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরকে অনেক এগিয়ে যেতে সহায়ক হয়েছে। বুরো বাংলাদেশ এক্ষেত্রে আমাদের মেন্টর।

মিনারা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
আলোহা সোশ্যাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ

বেসরকারি উন্নয়ন খাতের ডিজিটালাইজেশনের অগ্রযাত্রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব প্রযুক্তির ধারায় সংযুক্ত হতে সক্ষম হলাম।
ডিজিটালাইজেশন শুধু বেসরকারি উন্নয়ন খাতকেই নয়, পুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমেই যুগান্তকারী উন্নয়ন নিয়ে এসেছে। এখন প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের কার্যক্রম বোতাম টিপেই জানা যাচ্ছে। এখন আর কাগজে চিঠি লিখে নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, মোবাইল বা ল্যাপটপেই দেওয়া যায়। অল্প সময়ে সবাই অধিক কাজ করতে পারে। ডিজিটালাইজেশনের ফলেই অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রত্যয়ের সাথে এই আলোচনায় সংযুক্ত হতে পেরেছি। এখান থেকেই আমি অফিস কর্মে যুক্ত হই এবং পরামর্শ, নির্দেশনা ও অনুমোদন দিয়ে থাকি। বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য এমএফআইদের ডিজিটালাইজেশন দেশব্যাপী গ্রাহকদের সেবাকে আরও দ্রুত করার সুযোগ এনে দেবে।

এমএফআই হতে পারে ডিজিটাল ব্যাংকের অংশীদার

ড. আতিউর রহমান
অর্থনীতিবিদ
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

গণমানুষের উন্নয়ন দর্শনে বিশ্বাসী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং একজন জনবান্ধব সবুজ অর্থনীতিবিদ। তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্তর্ভুক্তি ও সবুজ অর্থায়নের এক নয়া বিপ্লবের সূচনা হয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা এবং নিয়মিতভাবে রিজার্ভ বেড়ে চলার মতো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী এই অর্থনীতিবিদ বরাবরই গরিব-হিতৈষী গবেষণা ও কর্মের জন্য সর্বজনবিদিত। ক্ষুদ্র অর্থায়নে তার রেগুলেটরি সহায়তা ও অর্জনের জন্য তিনি সুবিখ্যাত।

প্রত্যয় : বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রমকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ড. আতিউর রহমান : আমি বলব বিগত তিন দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক রূপান্তর হয়েছে। এই রূপান্তরের পেছনে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা প্রায় সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে ভালো দিক যেটি সেটি হলো নীতির পরম্পরা। সরকার বদলে গেলেও নীতির খুব একটা বদল হয়নি। অর্থাৎ উন্নয়নের জন্য সরকারকে নীতিগত সহায়তা দিতে হবে, রেগুলেটরি সহায়তা দিতে হবে। অন্যদিকে যেসব প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে কাজ করছে– প্রাইভেট সেক্টর বলতে আমি শুধু প্রফিট সেক্টরের কথা বলছি না, নন প্রফিট সেক্টর যে কাজগুলো করছে এই দুইয়ের মধ্যে এক ধরনের সম্পূরক সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে নানা রকম বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে এতকিছু সত্ত্বেও উন্নয়ন যে শুধু আর্থিক উন্নয়ন নয়, উন্নয়নের মাঝে সমাজ, সংস্কৃতি, পরিবেশ সবকিছু যুক্ত আছে– এই যে বহুমাত্রিক অ্যাপ্রোচ নেওয়া সম্ভব হয়েছে এমএফআই এবং সরকারের সম্পূরক নীতির কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। সরকার একা অনেক কিছু করতে পারে না। গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছাতে পারে না। এমনকি ব্যাংকও পারে না। তা হলে যে মানুষগুলো বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের জন্য কে করবেন? এই কাজটির অনেকটাই করছে এমএফআইগুলো। সেদিক থেকে উন্নয়নের এই বহুমাত্রিকতা, উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিবেশবান্ধব এবং সামাজিকভাবে গড়ে তোলার পেছনে এমএফআইদের ভূমিকা অসামান্য। এ কথাটি মানতেই হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী সংস্থাগুলো সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন দিক থেকে এখনও পিছিয়ে আছে বলে মনে করেন? এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আগামী দিনগুলোতে তারা কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে?

ড. আতিউর রহমান : ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর ঋণ দেওয়ার যে দক্ষতা সেটা পুরোপুরি তারা অর্জন করতে পারেনি। তবে আগের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ হতে পেরেছে। যেমন আমার কাছে একটি অঙ্ক আছে যে, একসময় ১ হাজার বর্গকিলোমিটারে তাদের শাখা ছিল ১৪০টি। আজ সেই শাখা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৭টি। আর গত ১০ বছরে এমএফআইয়ের বিতরণ করা ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ছয়গুণ। এই সংখ্যা ২৬ হাজার কোটি টাকা থেকে ১ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকাতে পৌঁছে গেছে। তার মানে শাখা যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বেড়েছে ঋণ বিতরণের পরিমাণ। তার মানে হলো তারা দক্ষ হয়েছে। তবে এই দক্ষতা আরও বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

এ কথা ঠিক যে, মানুষে মানুষে যোগাযোগ খুবই দরকার সংযোগ রক্ষার জন্য। তবে সবটার দরকার নেই। কোনো একটা শাখার কোনো একজন সদস্যকে টাকা দেওয়ার জন্য ক্যাশিয়ারকে তার শাখা কিংবা গ্রামে যাওয়ার দরকার নেই। এই টাকাটা যেকোনো মুহূর্তে মোবাইলে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আমার ধারণা সেটি অনেকেই দিচ্ছেন। তবে এই দেওয়ার প্রবণতা এখনও অতটা বাড়েনি। এটি বাড়া উচিত। আমার মনে হয় এটি একটি প্রতিবন্ধকতা। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর সুযোগ আছে।

এমএফআইগুলো বলার চেষ্টা করে যে মানুষটি ঘরে ঘরে গিয়ে মানবিক কাজকর্ম করে– প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে তা হলে তাকে তো উইথড্র করতে হবে। আমি তাকে উইথড্র করার পক্ষপাতী নই। তারাও থাকুক, তারা বরং সামাজিক কাজগুলোর ওপর বেশি জোর দেবেন, পরিবেশগত কাজগুলোর ওপর বেশি জোর দেবেন, টাকা লেনদেনের ব্যাপারটা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত প্রযুক্তির ওপর। দ্বিতীয় বাধা আমার কাছে মনে হয় ক্ষুদ্রঋণের আদায় খুব ভালো, প্রায় ৯৮ শতাংশ ঋণ আদায় হচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে সেভিংস মোবিলাইজেশনে সীমাবদ্ধতা। এটার জন্য এমএফআইরা দায়ী নয়। আমাদের কিছু রেগুলেটরি বাধ্যবাধকতার কারণে এমএফআইগুলো অনেক সময় পুরোপুরি সেভিংসটা তুলতে পারছে না। সদস্যদের কাছ থেকে যতটা সেভিংস অবারিত করা দরকার ছিল রেগুলেটররা সেটি অবারিত করেনি। অথচ ব্যাংকের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যত খুশি, যার কাছ থেকে খুশি ব্যাংক আমানত নিতে পারে। কিন্তু এমএফআইদের ক্ষেত্রে এ রকম একটা বাধ্যবাধকতা আছে যে, তাদের যে পরিমাণ পেইড আপ ক্যাপিটাল বা পুঁজি আছে তার নির্দিষ্ট শতাংশের বেশি সেভিংস নেওয়া যাবে না। এগুলো যদি তুলে দেওয়া যায় তা হলে অনেক বেশি সেভিংস তারা নিতে পারবেন এবং বেশি বেশি ঋণও তারা দিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে সরকার বা রেগুলেটরের দিক থেকে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, অনেক সময় কোনো কোনো এমএফআই এটিকে অপব্যবহার করে। তারা হয়ে যায় হায় হায় কোম্পানি। তবে এদের সংখ্যা বেশি না।

আমি মনে করি যে, এমএফআইগুলো যেহেতু এমআরএ কর্তৃক রেগুলেটেড সুতরাং রেগুলেটরি একটা সংস্থার পক্ষে অতটা বেপরোয়া হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এটি পরীক্ষিত এবং তারা ধরা পড়বে এমআরএ-এর রেগুলার মনিটরিংয়ের জালে। সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে যেমন ব্যাংক মনিটর করে তেমনি এমআরএও এমএফআইগুলোকে মনিটর করে। সুতরাং ভয় পাওয়ার এখনই কোনো প্রয়োজন নেই। আর ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাত এখনও বেশি স্থিতিশীল রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নির্দেশনা দিচ্ছে যে, ব্যাংকগুলো যেন অন্তত শতকরা ৫০% কৃষিঋণ নিজেরা দেয়। নিজেরা দিতে হলে তাদের অনেক ব্রাঞ্চ লাগবে, তাদের অনেক গ্র্যাজুয়েট বা এমএ পাস কর্মী লাগবে এবং তাদের যথেষ্ট বেতন লাগবে। এই যে খরচ এটি গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে ঋণ দিয়ে আবার তুলে আনাটা ব্যাংকের পক্ষে বেশ কঠিন। আমার কাছে মনে হয় বেস্ট অপশন হলো পার্টনারশিপ গড়ে তুলে এটিকে আরও প্রসারিত করতে হবে। এখন নির্দেশনা রয়েছে যে, ব্যাংক ৫০% এর বেশি টাকা দিতে পারবে না। এ বছর ব্যাংক টার্গেট করেছে ৩৫ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ দেবে। তার ৫০% মানে সাড়ে ১৭ হাজার কোটি টাকা এমএফআইগুলো দিতে পারবে। সুতরাং এমএফআইগুলো খুব বেশি ক্ষতির মুখে পড়বে না। তবে তাদের কাজের পরিসর বাড়ানো মুশকিল হবে। যদি এই বাধ্যবাধকতা না থাকত, তা হলে এমএফআইদের হয়তো আরও ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক বেশি দিতে পারত। এটি ব্যাংকের জন্য ভালো হতো যে সে কম খরচে যেখানে পৌঁছাতে চাচ্ছে সেখানে পৌঁছাতে পারত। সাধারণের সুবিধে হতো এ জন্য যে তারা বাড়তি ঋণ পেত।

> **“ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারের কারণে ব্যাংকগুলো অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে। আমরা দুয়েকটি এমএফআইকে দেখেছি তারা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং ফলাফল খুবই ভালো। এ জন্যই গবেষণাটা খুব দরকার। আমার মনে হয় যে ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই এবং এটা করলে এফিশিয়েন্সি বাড়বে।**

তাই রেকর্ড বলছে যে, এমএফআই যেখানে ৯৮% ঋণ আদায় করতে পারছে সেখানে তাদের কেন টাকা দেওয়া হবে না? প্রাইভেট ব্যাংকগুলো এটি বোঝে এবং এ জন্যই এমএফআইদের সাথে কাজ করতে তারা উৎসাহী। আমি যখন গভর্নর ছিলাম তখন বিদেশি ব্যাংকগুলো বলত আমাদের তো কোনো শাখা নেই, কোনো আউটলেট নেই, আমরা কীভাবে এত টাকা দেব? তখন আমি বলেছিলাম, যাদের আউটলেট আছে তাদের সাথে পার্টনারশিপ করতে। এভাবেই এটা গড়ে উঠেছে, সেন্ট্রাল ব্যাংক এখনও ৫০% দিতে বলছে।

আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা না রেখে এটিকে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, প্রাইভেট ব্যাংক সবসময় ২৪ শতাংশ কৃষিঋণ দিত, এখন সেটা ৫৯% হয়ে গেছে। প্রাইভেট ব্যাংকের এই বাড়ন্ত ঋণটা লিংকেজ প্রোগ্রামের কারণে হয়েছে। ফলে কৃষিতে দেওয়া ঋণের প্রায় সবই আদায় হয়ে আসছে। কারণ, একটি প্রফিট ওরিয়েন্টেড প্রাইভেট সেক্টর এবং নন-প্রফিট প্রাইভেট সেক্টর দুটো মিলেই কৃষিঋণের ক্ষেত্রে এই সাফল্যটা আনছে। কিন্তু এমএফআইগুলো শুধু কৃষিঋণ দেয় না। অনেকেই এটি বুঝতে পারে না যে গ্রামের অর্থনীতি বদলে গেছে, গ্রামের অর্থনীতি এখন শুধু কৃষি নয়। গ্রামের ৬০% আয়-রোজগার হয় অকৃষি থেকে। ৬০% যদি অকৃষি থেকে আসে তা হলে বুঝতে হবে যে, কেউ ছোটখাটো ফ্যাক্টরি দিচ্ছে, কেউ মাছের চাষ করছে, কেউ হাঁস-মুরগির খামার করছে, কেউ মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান দিচ্ছে, কেউবা অটো রিকশা চালাচ্ছে– এই কাজগুলোর জন্য অর্থ দরকার এবং ব্যাংক সবসময় ওই পর্যায়ে গিয়ে ঋণ দিতে পারছে না। ফলে তারা এমএফআইগুলোর কাছ থেকে নিচ্ছে। এমএফআইদের কাছ থেকে নিচ্ছে এই কারণে যে, ঋণগুলো তারা গ্রাহককে চিনে দেয় এবং চেনা গ্রাহকের ওপর তারা সুপারভাইজ করে। আবার গ্রাহকরাও যখনই লোন চায় তার কয়েক দিনের মধ্যেই তারা পেয়ে যায়। ফলে এমএফআই এখন বেশিরভাগই গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের টাকা দেয়। এখন ১০-২০ হাজার টাকার ক্ষুদ্রঋণ নেই, এখন ৫-১০ লাখ টাকা ঋণ দেয়।

প্রত্যয় : টাকার অঙ্কে বেশি ঋণ দেওয়ার কারণে অনেকে বলে যে এনজিওগুলো এখন ধনীদের

> প্রাইভেট ব্যাংক সবসময় ২৪ শতাংশ কৃষিঋণ দিত, এখন সেটা ৫৯% হয়ে গেছে। প্রাইভেট ব্যাংকের এই বাড়ন্ত ঋণটা লিংকেজ প্রোগ্রামের কারণে হয়েছে।

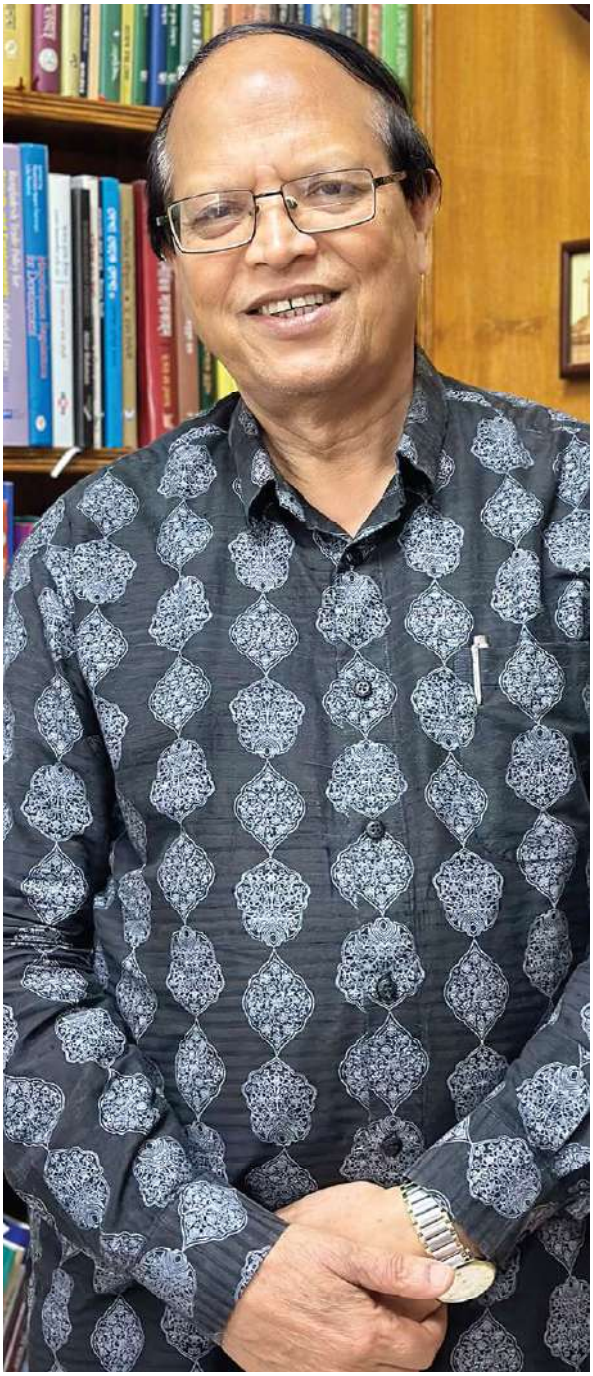

> ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারের কারণে ব্যাংকগুলো অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে প্রাইভেট ব্যাংক এখন খুবই এফিশিয়েন্ট।

ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। এটি কি উন্নয়ন হলো? বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখেন?

ড. আতিউর রহমান : আমি এটিকে উন্নয়ন বলব। ঢাকা শহরে যারা থাকেন তারা হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নেবে আর গ্রামের মানুষ পাঁচ লক্ষ টাকা নিলেই ধনী হয়ে যাবে এটা তো হয় না। কারণ, এই উদ্যোগে তারা যদি বড় হয় তখন তারা সেখানে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। দশ লক্ষ টাকা দিয়ে তারা যদি ছোটখাটো একটা ফ্যাক্টরি দেয় তখন তারা পাঁচ/দশ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এতে গ্রামে কর্মসংস্থান বাড়ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এসব উদ্যোগে নারীরা অংশগ্রহণ করছে। সবশেষ লেবার ফোর্স সার্ভে বলছে ৪৩% কর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে নারীরা করছে। ভারতে এর পরিমাণ ২৬-২৭%। সুতরাং আমরা যথেষ্ট ভালো করছি। আমি মনে করি যে, হাতে হাত রেখে চলার সংস্কৃতি শুধু ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের উন্নয়ন সংস্কৃতিতেও গড়ে উঠেছে। আমরা কোভিডকালে দেখেছি, স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের সময় দেখেছি, দুর্যোগ মোকাবিলার সময় দেখেছি। সবাই অর্থাৎ সরকার এবং বেসরকারি খাত যদি একসঙ্গে কাজ করে তা হলে মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা যায়।

প্রত্যয় : আর্থিক সেবা প্রদানে Digitization এবং Digitalization ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেবাকে কতটুকু টেকসই করে গড়ে তুলতে পারবে বলে মনে করেন? একই সাথে আর কোন কোন ক্ষেত্রে এই দুই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে?

ড. আতিউর রহমান : ব্যাংকিং খাতে ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারের কারণে ব্যাংকগুলো অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে প্রাইভেট ব্যাংক এখন খুবই এফিশিয়েন্ট। তারা আরটিজি ব্যবহার করে, ইএফটি ব্যবহার করে, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে। আমরা দুয়েকটি এমএফআইকে দেখেছি তারা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং ফলাফল খুবই ভালো। এ জন্যই গবেষণাটা খুব দরকার। আমার মনে হয় যে ডিজিটালাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই এবং এটা করলে এফিশিয়েন্সি বাড়বে। অনেকেই হয়তো বলবে, এতে লোকজনের কর্মসংস্থান কমে যাবে। আমি বলব যারা আছে তারা থাক, নতুন করে লোক নিয়োগ না দিয়ে এক্সটেশন করে এক্সিস্টিং স্টাফ দিয়েই পরিচালনা করুক। তবে কাজের পরিসর বাড়বে বলে কর্মসংস্থানও বাড়বে। প্রয়োজন প্রযুক্তিনির্ভর প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হোক। যেমন গার্মেন্টসের একটা অংশে রোবট ব্যবহার করছে, পুরোটা তো আর করছে না। বাকিগুলো কিন্তু হাতেই হচ্ছে। গার্মেন্টসের মতো মাইক্রোফাইন্যান্সেও তাই হবে। এ রকম একটা ব্লেন্ডেড অ্যাপ্রোচ নিতে হবে। ডিজিটাল এবং হিউম্যান– কোনো নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যাতে না হয়।

প্রত্যয় : MFS প্রতিষ্ঠানগুলো MFI-দের সাথে সেবার সহযোগিতা বিনিময় করছে। এতে গ্রাহকরা সময় ও দূরত্ব সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করছে। MFI-দের সেবা প্রদানে MFS প্রতিষ্ঠানগুলো আর কী কী সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে?

ড. আতিউর রহমান : এমএফআইগুলোর এমএফএসের সাথে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কে যাওয়া উচিত। এমএফএসগুলো মাত্র কিছু ক্যাশ আউটলেট করছে, কিন্তু যারা ঋণগ্রহণকারী তাদের সেভিংস প্রোগ্রামে নিয়ে আসা উচিত। প্রতি মাসে যদি তারা ১০০ টাকা করে সেভ করে, সেই টাকা নিয়ে হিসাব করে জমা দেওয়া খুবই জটিল বিষয়। কিন্তু বিকাশ কিংবা রকেটে যদি প্রোগ্রাম করা থাকে যে প্রতি মাসে আয়ের বরোয়ার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা জমা নিয়ে নেবে তা হলে এটা অনেক সহজ হবে। এমএফএসকে বলা যায় যে আপনি আমার বরোয়ার থেকে যে সঞ্চয়টা নিয়ে এলেন তার ৫০% আমাকে ইনভেস্ট করেন, তখন আমি আবার ওই টাকা ফেরত দিতে পারব। অর্থাৎ এমএফএস যেই সেভিংসটা করল সেটা তারা ব্যাংকে জমা না দিয়ে এমএফআইতে জমা দেবে। দরকার হলে ব্যাংকের চেয়ে ইন্টারেস্ট বেশি দেবে। প্রয়োজনে এমআরএর সহযোগিতা নিয়ে কাজটি করতে হবে যাতে তারা অনুমতি দেয়। এমআরএ আরও সহায়ক রেগুলেটর হতে হবে।

প্রত্যয় : দেশীয় MFI-গুলোর আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন? আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাফল্য অর্জনে

আপনার কী পরামর্শ থাকবে?

ড. আতিউর রহমান : আমার মনে হয় এটি খুবই ভালো হয়, কারণ মাইক্রোক্রেডিট বাংলাদেশের ব্র্যান্ড নাম। উগান্ডাতে দেখেছি সেখানে আমাদের এমএফআইগুলো কাজ করছে। ভারত, নেপাল ও অন্যান্য জায়গাতেও কাজ করছে। তারা ইন্টারন্যাশনাল উইং খুলে কাজগুলো করছে। আমার মনে হয় বুরো বাংলাদেশেরও ভাবা উচিত আন্তর্জাতিক হওয়া যায় কি না। কারণ, বাংলাদেশে তারা যে সাফল্য দেখিয়েছে, এই সাফল্যের একটা অংশ যদি ভারত, নেপাল কিংবা অন্যান্য দেশে দেখানো যায় তা হলে বাংলাদেশের সুনাম হবে।

প্রত্যয় : ক্ষুদ্র অর্থায়ন পরিচালনা সংক্রান্ত MRA আইন-২০০৬ আজকের বাস্তবতায় উপযোগী কি না? এই আইনকে যুগোপযোগী করে তোলার জন্য কী ধরনের সংশোধনী আনা প্রয়োজন?

ড. আতিউর রহমান : এরই মধ্যে এর সংস্কারের একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমি জানি এমআরএও এই আইনটাকে আপগ্রেড করার চেষ্টা করছে। এটি যেন ভালোর দিকে যায় সে জন্য স্টেক হোল্ডারদের সাথে আলোচনা করেই আইনটা করা উচিত এবং যতদূর জানি, স্টেক হোল্ডাররা ইতিমধ্যেই এমআরএর সাথে এ বিষয়ে কাজ করছে। এই সমন্বয় ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকুক।

সার্ভিস চার্জের বিষয়ে এমআরএও যে রেগুলেশন দিচ্ছে, সেগুলোর আরও পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আজকের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এই আইনে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। যেমন এমআরএও এর বোর্ডে এমএফআইদের প্রতিনিধি কোথায়? অন্তত সিটিএসকে তো সেখানে প্রতিনিধি করা যায়। আইনের এই দিকটা পরিবর্তন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

আমি একসময় গভর্নর হওয়ার কারণে এমআরএর চেয়ারম্যান ছিলাম। তখন এমআরএকে ঢেলে সাজানোর জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেই উদ্যোগের একটা ছিল 'সিআইবি'। একটা এমএফআই যে ঋণ দিচ্ছে সেখানে খেলাপি হয়ে আরেকটাতে যেন ওভারলেপ না করে সে জন্য আমরা 'সিআইবি' চালু করার জন্য কাজ করছিলাম। এখনও সেটা সম্পন্ন হয়নি। কয়েক দিন আগে আমি একটা অনলাইন মিটিংয়ে বসেছিলাম এমআরএর সাথে। তারা বলল শিগগিরই হয়ে যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এমআরএকে সাহায্য করেছিল, কারণ সিআইবি পরিচালনায় তাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। সে সময় আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ইডিকে এমআরএতে পাঠিয়েছিলাম তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করার জন্য। কিন্তু তারপরও এতদিন কেন লাগল জানি না। আমার নিজের একটা আশঙ্কা যে এটা দেরি হওয়ার বড় কারণ হলো বাংলাদেশ ব্যাংককে অতটা ইনভলব করা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে

> **“ একটি এমএফআই যে ঋণ দিচ্ছে সেখানে খেলাপি হয়ে আরেকটাতে যেন ওভারলেপ না করে সে জন্য আমরা 'সিআইবি' চালু করার জন্য কাজ করছিলাম। এখনও সেটা সম্পন্ন হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংক এমআরএকে সাহায্য করেছিল, কারণ সিআইবি পরিচালনায় তাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।**

বাংলাদেশ ব্যাংকের অভিজ্ঞতা অনেক ভালো। সুতরাং আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে এটি আরও আগেই হয়ে যেত। দেরি হলেও এটি দ্রুত চালু হোক সেই প্রত্যাশাই করছি।

প্রত্যয় : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ব্যাংক-এমআইএফ লিংকেজ' এর নীতিমালা অনুযায়ী বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের কৃষিঋণের ৭০% এবং সরকারি ব্যাংকগুলো তাদের বরাদ্দের অন্তত ১০-২০% এনজিও এর মাধ্যমে বিতরণ করে থাকে। সম্প্রতি এই পদ্ধতিতে ঋণ না দিয়ে সরাসরি ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা পৃথক জনবল নিয়োগ দিয়ে ঋণ বিতরণের কথা আলোচনা হচ্ছে– আপনার পরামর্শ কি?

ড. আতিউর রহমান : আগেই এ নিয়ে কথা বলেছি। নিশ্চয় এটি ঠিক হচ্ছে না। ব্যাংক নিজস্ব লোক নিয়োগ করে ১ টাকা ঋণ দিতে গেলে তার কত টাকা খরচ হবে আর এমএফআইকে লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে টাকা দিলে কত টাকা খরচ হবে? এই দুটোর একটি তুলনামূলক অঙ্ক করার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুদহারের বিষয়টি নিয়ে জাতীয়ভাবে আমরা খুব সমস্যায় আছি। তবে সুদই সবসময় বড় বিষয় না, বড় বিষয় এক্সেস। দক্ষিণ কোরিয়াতে একসময় সুদের হার ২০% ছিল। কিন্তু এক্সেস ছিল ১০০%। সে জন্য দক্ষিণ কোরিয়া অনেক দ্রুত উন্নয়ন করতে পেরেছে। আমাদের দেশে রাত ১২টার পর এমএফআইদের কাছ থেকে যে টাকা পাচ্ছে সেই টাকাটার একটা খরচ আছে। এটি যদি ক্ষতিকর হতো তা হলে ৯৮% গ্রহীতা কেন ফেরত দিচ্ছে। মানুষ কেন এমএফআইদের দিকে ঝুঁকছে? ব্যাংকে যারা কাচের দেয়ালের মধ্যে বসে আছে তাদের কাছে তো লুঙ্গি পরা কৃষক যেতে চাচ্ছে না এবং তাদের সাথে তো সেই ব্যবহারও করা হচ্ছে না। আমি গভর্নর থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, আমি যখন ১০ টাকার হিসাব খোলা শুরু করেছিলাম তখন এই লুঙ্গি পরা কৃষকদের ওয়েলকাম করতে ব্যাংকারদের মনের পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। ব্যাংকে এখনও অনেক কৃষক যেতে ভয় পায় কিন্তু এনজিওতে যেতে ভয় পায় না। এখন এমএফআই-এমএফএস দুইয়ে মিলে যদি কাজ হয়, তা হলে সবাইকে যুক্ত করা যাবে। ব্যাংকে যাওয়ার ভয় কেটে যাবে।

প্রত্যয় : এমএফআইদের দ্বারা ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

ড. আতিউর রহমান : বাধা তো অনেক আছে। যেমন সার্ভিস চার্জ নিয়ে একটা সমস্যা আছে, এটি ঠিক করে ফেলা উচিত। দ্বিতীয়ত আরও টেকনোলজি যেন ব্যবহার করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সরকার এখন ডিজিটাল ব্যাংক দেওয়ার একটা উদ্যোগ নিয়েছে।

এমএফআইগুলোর কোনো না কোনো উদ্যোগের সাথে পার্টনারশিপ হওয়া উচিত। বিকাশের পার্টনার হলো ব্র্যাক ব্যাংক। নতুন যে ডিজিটাল ব্যাংক হতে যাচ্ছে ১২৫ কোটি টাকার, সেখানে যদি কোনো এমএফআই ১০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করতে চায় তা হলে সেখানে পার্টনার তো হতেই পারে। আমি দেখলাম যে ৯টি ব্যাংক মিলে একটা ডিজিটাল ব্যাংক করতে যাচ্ছে। তা হলে ৯টি বা ১০টি এমএফআই মিলে কেন একটা ডিজিটাল ব্যাংক করতে পারবে না? আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের ডিজিটালি যেতে হবে। সুতরাং এমএফআইদের যদি একটা ডিজিটাল ব্যাংক থাকে তা হলে সেই ব্যাংক ডিজিটালি অনেক বেশি সাহায্য করবে। তাই প্রত্যেকেই একটা ব্যাংক না হওয়ার চেয়ে যৌথভাবে সবাই মিলে একটা ব্যাংক হওয়া উচিত এবং এখানে সিডিএফ দায়িত্ব নিতে পারে। এই নতুন ব্যাংকিং খাতে আরও উদ্ভাবনের অনেক সুযোগ রয়েছে। একটি-দুটো ডিজিটাল ব্যাংক চালু হতে যাচ্ছে। আশা করি এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও ডিজিটাল ব্যাংক করা যাবে। ওই সব ব্যাংকে এমএফআইগুলো যেন অংশীজন হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ■

নতুন সম্ভাবনা তৈরিতে ডিজিটাল সংযোগ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে

ইয়াসির আজমান
প্রধান নির্বাহী, গ্রামীণফোন

দেশের বৃহত্তম মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইয়াসির আজমান ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে এ পদে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মেধাবী নির্বাহী হিসেবে সুপরিচিত এই বাংলাদেশি এর আগে গ্রামীণফোনের ডেপুটি সিইও এবং সিএমও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশি পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব যিনি গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেছেন।
ইয়াসির আজমান ভারত ও নরওয়েতে টেলিনর গ্রুপের সাথে কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি লন্ডন বিজনেস স্কুল এবং ইনসিড- ফ্রান্সের বিভিন্ন নির্বাহী প্রোগ্রামে যোগদান করেছেন।

প্রত্যয় : আপনিই গ্রামীণফোনের প্রথম বাংলাদেশি সিইও। পুরোনো এই অনুভূতি নতুন করে শুনতে চাই।

ইয়াসির আজমান : ধন্যবাদ। গ্রামীণফোনের প্রথম বাংলাদেশি সিইও হওয়া নিঃসন্দেহে আমার জন্য সম্মানজনক একটি অর্জন। তবে এটি একই সাথে একটি গুরুদায়িত্ব যা সঠিকভাবে পালনের জন্য আমি সবসময় নিজের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতার উন্নয়নে কাজ করে চলেছি। তাই এটিকে একটি চ্যালেঞ্জও বলা যায়, যা আমি বেশ উপভোগ করি।
ডিজিটাল খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই খাতকে উত্তরোত্তর এগিয়ে নিতে সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযুক্তি ও ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। সংযুক্তি নিশ্চিত করার এই নিরলস চেষ্টায় নিবেদিত রয়েছে গ্রামীণফোন। আমাদের তরুণরা এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হচ্ছে; আর প্রযুক্তিকে পুঁজি করে দেশ, সমাজ ও জনগণের এমন ক্ষমতায়নে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যেতে পেরে গ্রামীণফোন অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী হিসেবে আমি যে স্বপ্ন দেখি, সেই একই স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা আমি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর একাগ্র দায়িত্ব পালনের মধ্যে খুঁজে পাই। আর সেটি হলো কানেক্টেড প্রযুক্তির মাধ্যমে সব স্তরে সব মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এখনই সময়।

প্রত্যয় : প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন– বিষয়টি একটু খুলে বলুন।

ইয়াসির আজমান : গ্রামীণফোন মনে করে, মানুষের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে প্রযুক্তি। আর সেই প্রযুক্তি সবার জন্য উন্মুক্ত হতে হবে, সেখানে সবার সমান প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। ২৬ বছর আগে আমরা যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীদের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক সহজলভ্য করা। নারীদের ক্ষমতায়নকে গ্রামীণফোন বরাবরই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এসেছে। আমরা দেশের সবার জন্য শুরুতে কানেক্টিভিটি নিশ্চিতে কাজ করেছি। পর্যায়ক্রমে গ্রামীণফোন দেশের ৯৯ শতাংশের বেশি মানুষের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি করেছে।

এরপর প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ বিষয়েও গ্রামীণফোন নিরলস কাজ করেছে। আমরা থ্রিজি ও ফোরজির মতো প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য করতে নিবেদিতভাবে কাজ করেছি। ফলে মানুষ এখন আরও বেশি ডিজিটালি সংযুক্ত থাকতে পারছেন, তাদের চিন্তা ও কাজের পরিসরও স্বাভাবিকভাবেই অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন সম্ভাবনা তৈরির ক্ষেত্রে ডিজিটাল সংযোগ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। আমরা দেখেছি, গ্রামীণফোনের দ্রুতগতির ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে এখন টাঙ্গাইলের মধুপুরের বাসিন্দারাও ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আসা কাজ ঘরে বসে করতে পারছেন। এছাড়া আমাদের ডিজিটাল বুক ফেয়ার এবং স্কুলে ইন্টারনেট সুবিধা নিয়ে আসার প্রচেষ্টা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করে তুলেছে। কুরবানির ঈদে অনলাইনে পশু কিনে এখন সময় বাঁচাচ্ছেন ও ঝামেলা কমাচ্ছেন অনেকেই। তাছাড়া দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা ই-কমার্স ও এফ-কমার্স উদ্যোক্তা, সেই সাথে সম্ভাবনাময় স্টার্টআপদেরও ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে চলেছে গ্রামীণফোন।

এখন আমরা অত্যাধুনিক এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে কাজ করছি। আমরা মানুষের স্মার্ট লাইফের প্রয়োজন পূরণে বাড়ি, অফিস, যানবাহন, স্বাস্থ্য, কৃষি, শহর ও বায়োনিক্সসহ বিভিন্ন খাতে স্মার্ট প্রযুক্তির অনন্য সুবিধা নিশ্চিতের প্রত্যয়ে আমাদের নতুন আইওটি প্রোডাক্ট লাইন ও অ্যাপ– আলো উন্মোচন করেছি যা জীবনযাত্রার প্রতিটি ধাপে স্মার্ট সল্যুশন নিশ্চিতে কার্যকরী ফলাফল বয়ে আনবে; মানুষের জীবনকে আরও নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর ও সুখী করে তুলবে।

করোনা–পরবর্তী সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অনলাইনে বাজার করার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। স্মার্টফোন ব্যবহার করে মানুষ যানবাহনের ব্যবস্থা করছে, ঘরে বসে খাবার অর্ডার করছে, বিল পরিশোধ করছে। প্রযুক্তি এভাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে অনেক বেশি সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলছে। ফলে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় মানুষ এখন অনেক বেশি ক্ষমতায়নের সুবিধা ও আত্মনির্ভরতা উপভোগ করতে পারছেন।

প্রত্যয় : গ্রামীণফোন প্রযুক্তিকে সাথে নিয়ে মানুষের ক্ষমতায়নে করতে চায়। বুরো বাংলাদেশের লক্ষ্য দেশের প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন। এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সেতুবন্ধন খুঁজে পান কি না?

ইয়াসির আজমান : আমরা যখন যাত্রা শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীদের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক সহজলভ্য করা। নারীদের ক্ষমতায়নকে গ্রামীণফোন বরাবরই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এসেছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে আমরা 'সেইফ ডিজিটাল স্পেস ফর গার্লস অ্যান্ড ইয়ুথ' প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে ৪ লাখ তরুণ, বিশেষত প্রান্তিক নারী ও কিশোরীদের ডিজিটাল জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও অনলাইনে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে সচেতনতা গঠনে কাজ আরম্ভ করেছি। আমাদের প্ল্যাটফর্ম শি-সহ অন্যান্য আপস্কিলিং উদ্যোগগুলোতেও নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ দেখা যায়। এছাড়াও প্রান্তিক অঞ্চলের নারীদের ইন্টারনেট ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' এই প্রকল্প গ্রহণ করি আমরা। এর মধ্য দিয়ে ২০০০ ইউনিয়নে নারীদের ইন্টারনেট বিষয়ে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। এভাবে ডিজিটাল ক্ষেত্রে নারীর সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছি আমরা। আর এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, ঠিক একইভাবে দেশের প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে বুরো বাংলাদেশ। আমি বলব, এখানে নিঃসন্দেহে একটি সেতুবন্ধন রয়েছে, যা আগামীতে দেশ ও সমাজের কল্যাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। আমাদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে, যাতে করে যে অভিন্ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, দ্রুততম সময়ের মধ্যেই তা অর্জন সম্ভব হয়।

প্রত্যয় : গ্রামীণফোনের সাথে বুরো বাংলাদেশের কর্পোরেট সম্পর্ক বেশ পুরোনো। এই সম্পর্ক কতটুকু মজবুত? এর মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান : সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ইতিবাচক, বৈষম্যহীন ও ফলপ্রসূ সামাজিক রূপান্তরে সবসময়ই আগ্রহী গ্রামীণফোন। দেশজুড়ে আমাদের অসংখ্য অংশীদার প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আমরা দেশের মানুষের উপকারের জন্য একযোগে কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশের নামটিও উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে দেশের ডিজিটাল সংযোগ নিশ্চিত ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে আমাদের অংশীদারত্ব দারুণ ফলাফল বয়ে এনেছে। দেশের আনাচে-কানাচে, প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার পাশাপাশি ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করেছে গ্রামীণফোন, যা ডিজিটাল বিশ্বের সাথে মানুষকে সংযুক্ত করা এবং তথ্য ও সেবার ক্ষেত্রে তাদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। বুরো বাংলাদেশের আর্থিক সেবাও একইভাবে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে গেছে। এতে করে তাদের সক্ষমতা ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণেরও উন্নত সুযোগ তৈরি হয়েছে। ডিজিটাল সংযোগ ও মোবাইলভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্থিক সেবা গ্রহণ করে প্রান্তিক ও গ্রামীণ পর্যায়ে অনেকেই এখন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠছেন। তাই বলা যায়, গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশের শক্তিশালী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষই ক্ষমতায়িত হচ্ছেন।

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশসহ দেশে বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এমএফআই ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণফোন এই প্রক্রিয়ার একটি অংশীদার। ভবিষ্যতে এই অংশীদারত্ব কোন মাত্রায় পৌঁছাতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান : বুরো বাংলাদেশসহ দেশের বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় এমএফআই অর্থাৎ মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার গ্রামীণফোনসহ সব অপারেটর। এই অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করার ফলে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরও আর্থিক খাতে অংশগ্রহণ বাড়বে। সঞ্চয়, ঋণ, বীমা বা অন্যান্য আর্থিক সেবা নিশ্চিত করা সহজ হবে। এর ফলে ঋণ সেবা, অর্থ লেনদেন ও গ্রাহক সেবা প্রদান করা অনেক বেশি কার্যকর ও স্বাচ্ছন্দ্য হবে। তাছাড়া ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করা গেলে তথ্য ও সেবায় মানুষের প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ বাড়বে। ফলে একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষেত্রেও তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে। প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষদের জন্য যদি ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করা যায় তবে এমএফআইয়েরও কার্যক্রম

> “গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে দেশের ডিজিটাল সংযোগ নিশ্চিত ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে আমাদের অংশীদারত্ব দারুণ ফলাফল বয়ে এনেছে।

> “প্রান্তিক পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রামীণফোনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে। এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্ভাবনী ও বৈচিত্র্যময় পণ্য নিয়ে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবে। মোবাইল ওয়ালেট, মাইক্রো-ইন্স্যুরেন্স, বিনিয়োগের সুযোগসহ বিস্তৃত আর্থিক সেবার সুযোগ তৈরি হবে। একই সাথে মাইক্রোফাইন্যান্সের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকির হার কমিয়ে আনা সহজ হবে; যা এই খাতকে টেকসই ও সম্ভাবনাময় হিসেবে হাজির করবে।

প্রত্যয় : দেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস আরও যুগোপযোগী করতে এবং গ্রাহক সেবা আরও উন্নত করতে গ্রামীণফোনের আর কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ আছে বলে আপনি মনে করেন?

ইয়াসির আজমান : বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করা ও আর্থ-সামাজিক খাতে প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিশীল গ্রামীণফোন। দেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা আরও যুগোপযোগী করতে ও গ্রাহক সেবা আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে গ্রামীণফোনের কিছু উদ্যোগ গ্রহণের জায়গা রয়েছে।

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের প্রতিটি মানুষকে আমাদের ডিজিটালাইজেশনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সবাইকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনা গেলেই দেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা প্রদান করা সহজ হবে। এই ডিজিটাল সেবা কার্যকরী উপায়ে সবার কাছে পৌঁছে দিতে তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রেও গ্রামীণফোন ইতিমধ্যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমি জিপি একাডেমি এবং জিপি অ্যাকসিলারেটরের মতো উদ্যোগকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে চাই, কেননা এর মাধ্যমে আমরা একদিকে ফিউচার-ফিট অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় পরিপূর্ণ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলছি, সেই সাথে সম্ভাবনাময় সব ব্যবসায় উদ্যোগ এবং এর পেছনের পরিশ্রমী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার চেষ্টা করছি।

প্রত্যয় : গ্রামীণফোন উদ্যোক্তা উন্নয়নে কাজ করে। বুরো বাংলাদেশের অন্যতম কাজও এটি। এক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগের কোনো সুযোগ আছে কি না?

ইয়াসির আজমান : জিপি অ্যাকসিলেরেটরের মতো নানা উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যাত্রার শুরু থেকেই দেশে উদ্যোক্তা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে গ্রামীণফোন। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের তরুণ ও প্রতিভাবানদের উদ্ভাবনী ব্যবসায় আইডিয়াগুলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও খাত সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দানের মাধ্যমেই আমরা ভবিষ্যতের জন্য সেরা প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা যুগোপযোগী করতে ও সার্বক্ষণিক গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন নেটওয়ার্কের কোনো বিকল্প নেই। এছাড়াও আমদের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানিয়ে ডেইলি স্টার ও সিএসআর উইন্ডোর মতো আয়োজক আমাদের হাতে ‘বাংলাদেশ সাসটেইনেবিলিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৩’ তুলে দিয়েছেন। এই অর্জনগুলো আমাদের আরও নিবেদিতভাবে কাজ করে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রশংসনীয়ভাবে বুরো বাংলাদেশেরও অন্যতম প্রধান কাজ এটি। প্রান্তিক নারী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে কার্যকরীভাবে কাজ করছে বুরো বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করলে এই সম্ভাবনাকে অনেক বেশি বিকশিত করার সুযোগ তৈরি হবে। প্রান্তিক পর্যায়ের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রামীণফোনের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হার আশানুরূপ রাখতে হলে উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে আর উদ্যোক্তাদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে সবরকম সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে গ্রামীণফোন।

প্রত্যয় : গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিভিন্ন দুর্যোগে ও প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের পাশে থাকে। আগামীতে সিএসআর কিংবা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে যৌথভাবে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ মানুষের পাশে থাকার সম্ভাবনা আছে কি না?

ইয়াসির আজমান : সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে নানারকম দুর্যোগ ও আর্তের প্রয়োজনে গ্রামীণফোন সর্বাত্মকভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষকে আমরা ফ্রি টকটাইমসহ নানা সুবিধা ও ত্রাণ দিয়ে আসছি। এতে করে এসব মানুষের দুর্দশা কিছুটা হলেও লাঘব হয়; পাশাপাশি তারা তাদের স্বজনদের জানানোর সুযোগ পান যে তারা নিরাপদে রয়েছেন। কোভিড-১৯ এর বৈশ্বিক মহামারির সময় এবং বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে গ্রামীণফোন সময়োপযোগী নানা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সবসময় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও আমরা জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব নেটওয়ার্ক তৈরিতে টেকসই সমাধানের উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করছি, যাতে আমরা আমাদের অংশীদারসহ সবার জীবনে এবং সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারি। আমাদের প্রতিশ্রুতির ধারাবাহিকতায় আমরা জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সঠিক নীতি প্রণয়নের গুরুত্ব নিয়ে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ এবং ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক

আলোচনা তৈরিতে ভূমিকা রাখছি। অনলাইন নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরতাকে আমাদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তকরণ নিশ্চিত করা আমাদের শিশুদের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য একটি অঙ্গীকার। কীভাবে নিরাপদে এবং দায়িত্বশীলভাবে ডিজিটাল জগতে বিচরণ করতে হয়, তা শেখানোর মাধ্যমে আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তোলার পাশাপাশি প্রযুক্তির পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখি। এক্ষেত্রে একই সাথে আমরা তাদের সুরক্ষা ও সুস্থতা নিশ্চিতেও কাজ করি। সম্প্রতি আমাদের পার্টনারদের সাথে আমরা 'ইনক্লুসিভ ডিজিটাল ফিউচার' নামে বেইজলাইন সার্ভের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিয়ে এ সার্ভে পরিচালনা করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল আটটি প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ, বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে আলোকপাত করা। ২০২৪ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ২৩ লাখ মানুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই জরিপের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সেবা ব্যবহার করেন যা সত্যি প্রশংসনীয়। এটি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে, সমাজ ও পরিবেশের জন্য গ্রামীণফোনের নিরলস প্রচেষ্টাগুলো এখন দেশ ও বিশ্ব পরিসরে স্বীকৃতি লাভ করছে। আমরা সম্প্রতি ব্লুমবার্গের সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্টে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করে নিয়েছি।

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশের সাথে গ্রামীণফোনের যৌথ পথচলা নিয়ে আপনার অভিমত কী?

ইয়াসির আজমান : বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশ। সময়ের পরিক্রমায় এই সহযোগিতা ও অংশীদারত্বের পরিধি যেন আরও বৃদ্ধি পায়, আমি অবশ্যই তা কামনা করছি। গ্রামীণফোন ও বুরো বাংলাদেশ উভয়েরই লক্ষ্য দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখা ও সামগ্রিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। দেশের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে চায় এমন সব প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোনকে তাদের সহযোগী হিসেবে পাশে পাবে। আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পথচলার মধ্য দিয়ে দেশের কোটি মানুষের উন্নয়ন সাধিত হবে, এটিই গ্রামীণফোনের প্রত্যাশা। ■

এমএফএস-এমএফআই অংশীদারত্ব দেশের অর্থনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন আনবে

কামাল কাদীর
প্রতিষ্ঠাতা এবং
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিকাশ

কামাল কাদীর; মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা এমএফএস প্রতিষ্ঠান 'বিকাশ' এর প্রতিষ্ঠাতা। দেশের প্রথম ও সর্ববৃহৎ এমএফএস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী নেতৃত্বের কাতারে নিজেকে শামিল করেছেন। ২০১১ সালে তার প্রতিষ্ঠিত বিকাশ বর্তমানে দেশের একমাত্র ইউনিকর্ন যার বাজারমূল্য ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। তিনি দেশের প্রথম অনলাইন মার্কেটপ্লেস 'সেলবাজার' এরও প্রতিষ্ঠাতা। কামাল কাদীর এর জন্ম যশোর জেলায়। তিনি শিল্পকলা ও অর্থনীতিতে স্নাতক করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ওবেরলিন কলেজে এবং এমবিএ সম্পন্ন করেছেন বিশ্বখ্যাত এমআইটি স্লোন স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে।

প্রত্যয় : বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বিকাশ। পাঠকদের জন্য এই অভিযাত্রা শুরুর গল্পটা বলুন। বিশেষ করে মোবাইল ফোনে সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়ার ভাবনাটা কীভাবে এলো?

কামাল কাদীর : এক যুগ আগেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য আর্থিক সেবা অতটা সহজলভ্য ছিল না। তবে তারা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত ছিলেন। আমাদের চিন্তায় ছিল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। বিকাশের সব কার্যক্রমের মূলেই রয়েছে সাধারণ মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা। পরিকল্পনা ছিল এমন একটি প্রযুক্তিভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা যা সবার জন্য ব্যবহার উপযোগী ও নিরাপদ হবে, বিশ্বাসযোগ্য হবে, যেখানে গ্রাহকরা টাকা পাঠানো ও গ্রহণ, মোবাইল রিচার্জ, পেমেন্টসহ প্রয়োজনীয় সব ধরনের আর্থিক সেবাই পাবেন। সেই ভাবনা থেকেই বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিকাশ তার কার্যক্রম শুরু করে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতি সহায়তাও বিকাশের অভিযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রত্যয় : বিকাশের এক যুগ পূর্ণ হলো। বিকাশের বিকশিত হওয়া কীভাবে সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন?

কামাল কাদীর : আধুনিকতম প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ ফিচার ফোন থেকে শুরু করে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী সবার জন্য আর্থিক সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে লেনদেনে সক্ষমতা ও স্বাধীনতা আনার প্রয়াস নিয়েছিল বিকাশ। পাশাপাশি প্রথাগত ব্যাংকিংয়ের মতো শাখা খোলার পরিবর্তে দেশজুড়ে ৩ লাখ ৩০ হাজার এজেন্টের বড় এক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে বিকাশ। দেশজুড়ে হাঁটা-দূরত্বে অবস্থান করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে পাশে থাকা এই বিকাশ এজেন্টরা নিজ নিজ এলাকায় পরিচিতি পেয়েছেন

'হিউম্যান এটিএম' হিসেবে। এই এজেন্ট নেটওয়ার্কের কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের বাস্তবসম্মত নীতিসহায়তা, মোবাইল অপারেটরদের দেশব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, ক্যাশ ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাংকের সহায়তা এবং সর্বোপরি কোটি গ্রাহকের আস্থাই বিকাশকে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। পাশাপাশি বিকাশের এই অগ্রযাত্রায় সারথি হয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানি ইন মোশন এলএলসি, বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অন্তর্গত ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন, চীনের আলিবাবা অ্যাফিলিয়েট অ্যান্ট গ্রুপ এবং জাপানের সফটব্যাংকের মতো বিনিয়োগকারীরা।

প্রত্যয় : এমএফএস প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাধারণ মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জন বিকাশের একটি লক্ষ্য। এমএফআইদের এসব সম্ভাবনাকে কীভাবে দেখছেন? এই মানুষদের ডিজিটাল লেনদেনে আগ্রহী করতে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

কামাল কাদীর : বর্তমানে বিকাশের ৭ কোটি ৩০ লাখ ভেরিফায়েড গ্রাহক রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের দৈনন্দিন লেনদেনে স্বাচ্ছন্দ্য, সক্ষমতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি আমরা। পাশাপাশি ২০৪১-এ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের ডিজিটাল অভিযাত্রার সহযোগী হয়ে ক্যাশলেস পেমেন্ট ইকোসিস্টেমকে সমৃদ্ধ করার পথে হাঁটছি আমরা। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে শক্তিশালী এবং টেকসই করতে হলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় এবং অংশীদারত্বের কোনো বিকল্প নেই। বিকাশ বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সঙ্গে নিয়ে ডিজিটাল লোন, সেভিংস, রেমিট্যান্সের মতো সেবা নিয়ে এসেছে যা গ্রাহকরা সাদরে গ্রহণ করেছেন। ১০০টি দেশে বাস করা প্রবাসী বাংলাদেশিরা ৮৫টি আন্তর্জাতিক মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান হয়ে দেশীয় ২২টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে সেটেলমেন্ট করে সরাসরি প্রিয়জনের বিকাশ অ্যাকাউন্টে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন। আবার বিকাশের পে-রোল সল্যুশন ব্যবহার করে শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছে ১১শর বেশি পোশাক কারখানা যা শ্রমিকদের ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তেমনিভাবে দেশের এমএফআইগুলোর বিতরণ এবং আদায় কার্যক্রম বিকাশের মতো সেবাকে ব্যবহার করার মাধ্যমে পুরো আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী করতে পারবে। ফলে ক্ষুদ্রঋণের উপকারভোগীরা যেমন সহজেই ঘরে বসে ঋণ গ্রহণ, পরিশোধ, সঞ্চয়সহ নানাবিধ আর্থিক সেবা নিতে পারবেন, তেমনি এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলো আরও সাশ্রয়ী এবং কার্যকরভাবে তাদের সেবা দিতে সক্ষম হবে।

প্রত্যয় : আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে বুরো বাংলাদেশ ও বিকাশের অংশীদারত্বকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

কামাল কাদীর : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে কার্যকর করতে মাঠপর্যায়ে সম্পৃক্ত থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে একত্রে কাজ করা জরুরি। দেশের অন্যতম শীর্ষ এমএফআই প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের আছে দেশজুড়ে বিশাল নেটওয়ার্ক এবং ২৫ লাখেরও বেশি সদস্য। এই সদস্যদের ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ এবং সঞ্চয় স্কিমের কিস্তি প্রদান সহজ করতে বুরো বাংলাদেশ এবং বিকাশের যৌথ প্রয়াস সুবিধাভোগীদের ভাগ্য উন্নয়নে ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া ভবিষ্যতের উন্নত, স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায় একটি ক্যাশবিহীন সমাজের বাস্তবায়নেও এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। এই ক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশের মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করার সুযোগকে বিকাশ সবসময় স্বাগত জানায়।

প্রত্যয় : সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গাতে বুরো বাংলাদেশ ও বিকাশ অঙ্গীকারবদ্ধ। সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআরের নিরিখে এই দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশীদারত্বের কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন?

কামাল কাদীর : শুরু থেকেই বিকাশ সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বই পড়া, বিজ্ঞান চর্চা, চিকিৎসাসেবার মতো কাজে যুক্ত রয়েছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র পরিচালিত বইপড়া কর্মসূচিতে এ পর্যন্ত তিন হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিন লাখ বই বিতরণ করেছে বিকাশ, যার মাধ্যমে অন্তত ৩০ লাখ পাঠক উপকৃত হয়েছেন। বিজ্ঞান চর্চায় স্কুল শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন বিজ্ঞান চিন্তার সাথে যৌথভাবে দেশজুড়ে বিজ্ঞান উৎসব আয়োজন করে আসছে বিকাশ। করোনা মহামারি চলাকালীন চিকিৎসা সহায়তার অংশ হিসেবে ভেন্টিলেটর, থার্মোমিটার, মাস্কসহ সাড়ে ৯ লাখ জরুরি স্বাস্থ্যসামগ্রী, নতুন হাসপাতাল, অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন ইত্যাদি কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে বিকাশ। বুরো বাংলাদেশ ও বিকাশ– দুটি প্রতিষ্ঠানেরই নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গায় যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ আছে।

প্রত্যয় : বিকাশের আবির্ভাব দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সংস্কৃতিকে কতটুকু বদলে দিয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

কামাল কাদীর : বিকাশ দেশের সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার আর্থিক লেনদেনকে করেছে সহজ, দ্রুত এবং নিরাপদ। লেনদেনে সক্ষমতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ডিজিটাল অর্থ লেনদেনের সমার্থক হয়ে উঠেছে বিকাশ। প্রয়োজনীয় সব সার্ভিস এক প্ল্যাটফর্মে পাওয়ায় গ্রাহকরা ডিজিটাল লেনদেনে আগ্রহী হচ্ছেন যা তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভ্যাসগত পরিবর্তন আনছে, যা একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রায় ক্যাশবিহীন লেনদেনের ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করছে। বিকাশের প্ল্যাটফর্মে সাধারণ ক্যাশ ইন, ক্যাশ আউট, সেন্ড মানি, মোবাইল রিচার্জ সেবার পাশাপাশি মার্চেন্ট পেমেন্ট, ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফি, বিভিন্ন সরকারি সেবার ফি, বাস-ট্রেন-বিমানের টিকেট কাটা, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ডোনেশন– সব ধরনের লেনদেনই করা যাচ্ছে। এছাড়াও আছে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল লোন, সেভিংস, রেমিট্যান্সের মতো সেবাও। এই সেবাগুলোর ধারাবাহিকতায় সামনে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও গ্রাহকবান্ধব প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সেবা যুক্ত হবে বিকাশের প্ল্যাটফর্মে যা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনবে বলেই আশা রাখি।

প্রত্যয় : বিকাশের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের মতো এনজিও-এমএফআইগুলোর ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দেশের মানুষের অর্থনৈতিক সংস্কৃতিতে অধিকতর কোনো মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে কি না?

কামাল কাদীর : ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিকাশ একটি এমএফআই সল্যুশন তৈরি করেছে যা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং আদায় প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে। একদিকে এমএফআই প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যূনতম সময়ে ঋণ বিতরণ করতে পারছে, অন্যদিকে গ্রাহকরাও ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন ঘরে বসেই। ঋণ বিতরণ এবং আদায় প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড হওয়ায় এমএফআই প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক দুই পক্ষই বাঁচাতে পারছে মূল্যবান সময় এবং খরচ। পাশাপাশি এই ডিজিটাল সল্যুশনটি ব্যবহার করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের কিস্তির রিয়েল টাইম মনিটরিং, রিয়েল টাইম অ্যাকাউন্ট মনিটরিংসহ আরও বেশকিছু সুবিধা পেয়ে থাকে। দেশে ডিজিটাল পেমেন্টের পরিধি যত বাড়বে, তত খরচ ও সময় সাশ্রয় হবে, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। শুধু তাই নয়, এতে করে কার্বন নিঃসরণ কম হবে যা পরিবেশ সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে। স্মার্ট অর্থনীতির পথে দেশকে এগিয়ে নিতে বুরো বাংলাদেশের মতো এনজিও-এমএফআইগুলোর সঙ্গে বিকাশের কাজ করার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। ■

প্রযুক্তি কখনোই আমাদের অভিজ্ঞতার বিকল্প হবে না

ইমরান আহমেদ
ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
শক্তি ফাউন্ডেশন

শক্তি ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমরান আহমেদ বাংলাদেশের এনজিও-এমএফআই সেক্টরের তরুণ নেতৃত্বের একজন। তিনি দেশের অন্যতম বেসরকারি এই উন্নয়ন সংস্থার ক্ষুদ্র অর্থায়ন, স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ সব কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একই সাথে তিনি অর্থ ও প্রশিক্ষণ বিভাগ ছাড়াও শক্তির সদস্যদের উন্নততর পরিষেবা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণে আইটি বিভাগের সার্বিক দিকনির্দেশনা দেন।

শক্তি ফাউন্ডেশনে দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'কমস্কোর' (ComScore) নামক একটি স্বনামধন্য ডেটা এনালিটিকস প্রতিষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এখানে তিনি গ্রাহক সেবা ও পণ্য বিষয়ক ব্যবসায়িক ইউনিটগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানিতে অপারেশন ও স্ট্র্যাটেজি বিষয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। ইমরান আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের ব্রান্ডিস ইউনিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও ফিন্যান্স বিষয়ে এমএ এবং বার্ড (Bard) কলেজ থেকে গণিতে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রত্যয়: শক্তি ফাউন্ডেশন ও মাইক্রোফাইন্যান্সের যোগসূত্র কোথায়?

ইমরান আহমেদ: শক্তি ফাউন্ডেশন নারীর উন্নয়নে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি চারটি: ১. মাইক্রোফাইন্যান্স ২. সুস্বাস্থ্য ৩. জলবায়ু সুরক্ষা ও ৪. নারীর ক্ষমতায়ন। এই চারটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই শক্তির এগিয়ে চলা। এই চারের মিশেলে আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আর্থ-সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। অর্থাৎ নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করাই আমাদের গন্তব্য। নারীর ক্ষমতায়নের এই যাত্রায় মাইক্রোফাইন্যান্স একটি উপাদান মাত্র। মাইক্রোফাইন্যান্স আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়।

প্রত্যয়: মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে ডিজিটালাইজেশন কিংবা প্রযুক্তির কি ধরনের প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

ইমরান আহমেদ: শক্তি ফাউন্ডেশন ৩২ বছরের পুরোনো একটি প্রতিষ্ঠান। এটি মূলত পিছিয়ে পড়া নারীদের নিয়ে কাজ করে। আরও স্পষ্ট করে বললে, আমাদের টার্গেট গ্রুপ হলো সবচেয়ে কম উপার্জনক্ষম ২০% জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকগুলো এখনও পৌঁছতে পারেনি। ফলে মাইক্রোফাইন্যান্সের ভূমিকা বা অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না। আমরা যারা নেক্সট জেনারেশন মাইক্রোফাইন্যান্স প্র্যাকটিশনারস তাদের আগেই কিন্তু ফার্স্ট জেনারেশন এই সেক্টরকে একটি জায়গায় নিয়ে এসেছেন। তারা নারীদের ঘরের বাইরে উপার্জন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে পেরেছেন। যে নারীরা আগে টাকার সাথে পরিচিতই ছিল না তারা এখন ব্যবসা করেন। ফলে এই জেনারেশনের আমরা যারা আছি তাদের লক্ষ্য হলো এই উদ্যোক্তা নারীরা যাতে তাদের উদ্যোগ বা ব্যবসাকে আরও বড় করতে পারে। আমি বিষয়টিকে ব্যবসা না বলে যদি তাদের উপার্জন-সক্ষমতা বলি, তা হলে সেটা আরও স্পষ্ট অর্থবহন করবে।

অর্থাৎ আমরা নারীদের উপার্জন সক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কাজ করছি। এই উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধির মূল জায়গাটা হলো একজন নারী যে পণ্যটি উৎপাদন করছেন তার জন্য যে উপকরণ দরকার তার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং সে যা উৎপন্ন করছে তার বাজার সৃষ্টির পথটা আরও সহজ করে দেওয়া। আর এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম বা খাত হচ্ছে প্রযুক্তি। ফলে এই প্রযুক্তি খাতে আমরা যথেষ্ট বিনিয়োগ করছি। শক্তি ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়েই ৪৬ জন কর্মী আছেন যারা শুধু এই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উৎকর্ষ নিয়ে কাজ করেন। আমাদের ইআরপি (এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং) সফটওয়্যার আমাদের নিজেদের তৈরি করা। আমাদের প্রতিটি মাইক্রোফাইন্যান্স অফিসার এখন স্মার্টফোন ব্যবহার করে। এই ফোন আমরাই সরবরাহ করি। ফোনগুলোতে অ্যাপস ব্যবহারের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কালেকশন হচ্ছে। ফলে আমাদের শাখা অফিসগুলোতে এখন আর কাগজের ব্যবহার নেই। আপনি জেনে খুশি হবেন, পেপারলেস হওয়ার কারণে গত অর্থবছরে আমাদের খরচ কমেছে তিন কোটি টাকারও বেশি। এর প্রভাব অনেক। এটি সত্য, পেপারলেস বা ডিজিটাল হওয়ার জন্য আমাদের অনেক প্রশিক্ষণ দিতে হয়েছে, অর্থাৎ অর্থ ও সময় বিনিয়োগ করতে হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, এর সুফল অনেক। আমি বলব, টেকনোলজি ছাড়া এই সেক্টরের ভবিষ্যৎ নেই। কারণ মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের পরিচালনা ব্যয় টেকনোলজির ব্যবহার ছাড়া কমানো সম্ভব নয়।

প্রত্যয়: অনেকে মনে করেন, এনজিও-এমএফআই সেক্টর যদি বেশি মাত্রায় প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে তা হলে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে গ্রাহকদের সাথে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হতে পারে। সেক্ষেত্রে মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরের জন্য কতটুকু প্রযুক্তি প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

ইমরান আহমেদ: এই সেক্টরটা নন প্রফিট। গ্রাহকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগের কোনো বিকল্প এই সেক্টরের নেই। যদি এর উল্টোটা ঘটে তা হলে আমরাও শেষ পর্যন্ত ব্যাংকের মতোই হয়ে যাব। সম্পর্কটা তখন টাকা আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। মনে রাখতে হবে, সদস্যদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ধরে রাখতে না পারলে আমরা এগুতে পারব না। মূলত এ কারণেই শক্তি ফাউন্ডেশন তার সদস্যদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বজায় রাখার পাশাপাশি আধুনিক টেকনোলজির ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। অর্থাৎ শক্তির মূলমন্ত্র আগে ছিল- হাই টাচ, হাই ট্রাস্ট। আর এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে হাই টেক। টেকনোলজি থাকবে, তবে সেটি কোনোভাবেই হাই টাচের বিকল্প হতে পারবে না। মাঠ পর্যায়ের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মকর্তারা টেকনোলজি ব্যবহার করছে দ্রুততম সময়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাহককে উন্নত সেবা দেওয়ার জন্য, তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নয়। আমাদের ডিজিটাল হওয়ার অর্থ গ্রাহকের ব্যবসাকে আরও লাভজনক হওয়ার সুযোগ করে দিতে আরও কার্যকর সহায়তা দেওয়া। একজন নারী গ্রাহক, যার পক্ষে বাজারে গিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা কষ্টকর সে ঘরে বসেই ওই কাজটি করতে পারল কি না সেটাই আমাদের দেখতে হবে। গ্রাহক ও আমাদের কর্মীদের কাজকে সহজ করার জন্যই টেকনোলজি বা ডিজিটালাইজেশন।

মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে টেকনোলজির আরেকটি বড় ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের এই সেক্টরে লেনদেন প্রায় দুই লক্ষ কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ অর্থের ক্যাশলেস লেনদেন সম্ভব হচ্ছে এই ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের কারণেই। যেখানেই নগদ লেনদেন সেখানেই অনিয়মের ঝুঁকি থাকে। টেকনোলজি আমাদের জন্য সেই ঝুঁকি কমিয়ে দিয়েছে। ব্র্যাক, বুরো বা শক্তি ফাউন্ডেশন- প্রত্যেকেই এই ডিজিটাল মাইক্রোফাইন্যান্স দিয়ে তাদের গ্রাহক ও কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। আরও স্পষ্ট করে যদি বলি, আমাদের কাছ থেকে যে সদস্য ঋণ নিচ্ছে এবং সেই ঋণের কিস্তি আমরা যার কাছ থেকে ফেরত নিচ্ছি সে যে ওই একই ব্যক্তি, ডিজিটাল মাইক্রোফাইন্যান্সের কারণে সেটা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। শক্তি ফাউন্ডেশন তার প্রতিটি সদস্যের পাশবইয়ে কিউআর কোড যুক্ত করেছে। আমাদের মাঠ কর্মীরা সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে সেই কোড তার স্মার্টফোনে স্ক্যান করেন। আমাদের সিস্টেম বা সার্ভারে তাৎক্ষণিকভাবে রেকর্ড হয়ে যায় যে সেই কর্মী তার গ্রাহকের কাছে সেবা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

প্রত্যয়: যদি গ্রাহকদের প্রসঙ্গে আসি, বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের গ্রাহকরা প্রযুক্তি সাথে নিজেদের কতটুকু খাপ খাইয়ে নিতে পারবে বলে আপনার মনে হয়?

ইমরান আহমেদ: টেকনোলজি কিংবা ডিজিটালাইজেশন মানুষকে কিছুটা হলেও যে অধৈর্য করে তুলছে তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো, টেকনোলজিকে গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের গ্রাহকরা যদি টেকনোলজি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ না করে তা হলে আমাদের কর্মীরা সেটি ব্যবহার করে গ্রাহকদের সহায়তা করবে। আমরা এটি প্রত্যাশা করি না যে, আমাদের গ্রাহকরা শতভাগ টেকনোলজি ব্যবহার করবে। তার মূল চিন্তা থাকবে তার ব্যবসা বা উদ্যোগটাকে কীভাবে আরও বেশি লাভজনক বা সম্প্রসারিত করা যায়। কিন্তু আমাদের কর্মীদের চিন্তা থাকবে টেকনোলজি ব্যবহার করে তাদের এই লক্ষ্য অর্জনে কীভাবে সহায়তা করা যায়। এটুকুই যথেষ্ট।

প্রত্যয়: প্রযুক্তির ব্যবহার কি শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে অর্থাৎ ঋণ বিতরণ, কিস্তি আদায় ও সঞ্চয় উত্তোলনে; নাকি আরও কোনো জায়গা রয়েছে যেখানে প্রযুক্তির ব্যবহার সেক্টরকে অধিকতর শক্তিশালী করতে পারে?

ইমরান আহমেদ: আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি নিয়ে, আমাদের গ্রাহকদের সুরক্ষার ব্যাপারে। এখন বলি শক্তি ফাউন্ডেশন নিয়ে। সত্যি কথা বলতে আমরা যে ডিজিটালাইজেশন করেছি তার সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে শক্তি ইন্টারনালে। আমি আগেই বলেছি, আমাদের শাখাগুলো এখন পেপারলেস। দ্বিতীয়ত আমাদের মনিটরিংয়ের সুযোগ আরও বেড়ে গেছে। রিপোর্টগুলো এখন তাৎক্ষণিকভাবেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কোন কর্মীর কালেকশন হয়েছে, কোন কর্মীর হয়নি, কে অসুস্থ- এর সব তথ্যই তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই সেক্টরের প্রতিটি সংস্থারই মূল শক্তি হচ্ছে তার কর্মী। এই কর্মীদের সঠিক মূল্যায়ন করাটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এই কাজে পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক। টেকনোলজি আমাদের এই মূল্যায়নের কাজটা সহজ করে দিয়েছে। এখন অ্যাপসের মাধ্যমেই একজন কর্মীর সরাসরি সুপারভাইজার তার মূল্যায়ন করে দিচ্ছে। বহু হাত ঘুরে এখন আর সেটা হয় না। যদি বেতনের কথা বলি, আগে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের কাছে স্যালারি শিট যেত, তিনি কর্মীদের টাকাটা দিয়ে দিতেন। কিন্তু এটা তো একটা ব্যক্তিগত বিষয়। বেতন এখন সরাসরি কর্মীর ডিজিটাল ওয়ালেটে চলে যাচ্ছে। পে-রোলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। আমাদের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ প্রশিক্ষণ এখন অনলাইনে হয়। জুম, মাইক্রোসফট টিমসের মতো অ্যাপসগুলো এখন দৈনন্দিন কাজের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কোভিডের আগে যেটি কল্পনাও করা যেত না। তবে এতসব ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়- আমরা কী দিন দিন কর্মীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হারাতে বসেছি!

প্রত্যয়: প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা কিংবা এর ইতিবাচকতা- এগুলো সবই যুগের চাহিদা ও বাস্তবতা। ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন প্রযুক্তি যুক্ত হচ্ছে, নতুন নতুন যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। এ বিষয়ে এই সেক্টরের কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন। তারা এই আধুনিকায়নকে কীভাবে দেখছে, কীভাবে নিচ্ছে?

ইমরান আহমেদ: এই সেক্টরের যারা নতুন প্রজন্মের কর্মী, যারা মাঠে কাজ করে, যাদের কর্মজীবন তিন থেকে চার বছর– তারাই সবচেয়ে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। তারা টেকনোলজিকে বুঝে। আমাদের হাজিরা এখন ডিজিটালাইজড। আমাদের সব শাখায় ওয়াইফাই সংযোগ আছে। তবে যারা একটু পুরোনো, বিশেষ করে যাদের কর্মজীবন আট থেকে পনেরো বছর তাদের প্রশিক্ষণ দিতে একটু বেশিই বেগ পেতে হচ্ছে। কারণ টেকনোলজির

সাথে বয়সেরও একটা যোগসূত্র আছে। এই ক্যাটাগরির কর্মীদের টেকনোলজি ব্যবহারের মূল্য বা গুরুত্বটা আগে বোঝাতে হয়। যখন তারা বুঝতে পারে টেকনোলজি ব্যবহারের ফলে তাদের উপযোগিতা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তখনই তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সচেষ্ট হয়। আমি এখানে দুটি উদাহরণ দিতে চাই। প্রথমে অ্যাকাউন্ট্যান্টের কথাই ধরুন। মাঠ কর্মীর কাছ থেকে বিশাল কালেকশন শিট নিয়ে এখন আর তাকে সারা দিন বসে হিসাব মেলাতে হয় না। মাঠ কর্মী গ্রাহকের কাছ থেকে কিস্তি কালেক্ট করে যখন তার মোবাইলে আপলোড দিচ্ছে ঠিক সাথে সাথেই সেটি তার ডিভাইসেও সিনক্রোনাইজড হয়ে যাচ্ছে। এতে করে একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টের দিনে গড়ে চার ঘণ্টা সময় বেঁচে। এই সময়টাতে সে পাশবই চেকসহ অন্যান্য আর কাজে সময় দিতে পারছে। ডিজিটালাইজেশনের ফলে আট-দশ কোটি টাকার একটি শাখার জন্য একজন অ্যাকাউন্ট্যান্টই যথেষ্ট। দ্বিতীয়ত, শক্তি ফাউন্ডেশনই একমাত্র এনজিও-এমএফআই যে এককভাবে বিকাশের সর্ববৃহৎ এজেন্ট। আমাদের তিন হাজার কর্মী বিকাশ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। আগে একজন গ্রাহককে বাজারে গিয়ে বিকাশে পেমেন্ট করতে হতো, কিন্তু এখন আমার কর্মীরাই তাদের বাড়িতে গিয়ে সে কাজটা করে দিচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকেরও সময় বেঁচে যাচ্ছে, এই সময়টাতে সে ব্যবসাসহ সংসারের কাজে মনোযোগী হতে পারছে।

প্রত্যয়: ডিজিটালাইজেশনের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটুকু সংকুচিত হবে বলে মনে করেন? মানে সেক্টরের কর্মীদের চাকরি হারাবার আশঙ্কা কতখানি?

ইমরান আহমেদ: চাকরি হারানোর সাথে ডিজিটালাইজেশন নয় বরং গ্রোথের সম্পর্কটাই মুখ্য বলে আমি মনে করি। যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ থাকবে ততদিন পর্যন্ত কর্মীদের চাকরি হারাবার কোনো শঙ্কা নেই। বরং টেকনোলজির কারণে প্রতিষ্ঠানের গ্রোথ আরও বেড়ে যাবে। অর্থাৎ টেকনোলজি কর্মীর প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে দেবে। টেকনোলজি কর্মীর বিকল্প- এটা ভুল ধারণা। পাশাপাশি কর্মীকেও বুঝতে হবে টেকনোলজির সাথে তাকেও খাপ খাইয়ে নিতে হবে, যুগের সাথে তাল মেলাতেই হবে। তবে আমি এটাও বলব, শুধু টেকনোলজি দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান বেশিদূর এগোতে পারে না। অভিজ্ঞ বা পুরোনো কর্মীরও প্রয়োজন আছে। মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টর আজকের অবস্থানে এসেছে ট্রাডিশনাল কর্মীদের হাত ধরেই। টেকনোলজি কখনোই অভিজ্ঞতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। টেকনোলজি আমাদের হাতিয়ার, কিন্তু সিদ্ধান্তটা আমাদেরই।■

> “অর্থাৎ শক্তির মূলমন্ত্র আগে ছিল- হাই টাচ, হাই ট্রাস্ট। আর এখন এর সাথে যুক্ত হয়েছে হাই টেক। টেকনোলজি থাকবে, তবে সেটি কোনোভাবেই হাই টাচের বিকল্প হতে পারবে না।

> “টেকনোলজি কর্মীর বিকল্প- এটা ভুল ধারণা। পাশাপাশি কর্মীকেও বুঝতে হবে টেকনোলজির সাথে তাকেও খাপ খাইয়ে নিতে হবে, যুগের সাথে তাল মেলাতেই হবে।

সফিউল আলম

পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স
সাজেদা ফাউন্ডেশন

সাজেদা ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে রয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করার সুযোগ ঘটেছে। এতে ম্যানিপুলেশনের সুযোগ নেই এবং দুর্নীতিও অনেক কমে আসে। ক্যাশ টাকা হাতে নেওয়া হয় না। ঋণ বিতরণের টাকা দ্রুত ঋণগ্রহীতার হিসাবে জমা হয়ে যাচ্ছে। আবার কিস্তির টাকাও ঋণ পরিশোধ হিসাবে জমা হয়ে যাচ্ছে বিকাশের মাধ্যমে।

ডিজিটাল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য দক্ষ জনবল দরকার। এ জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্রেনিংয়ের জন্য আলাদা বাজেট রাখা প্রয়োজন। সাজেদা ফাউন্ডেশন এটা রেখে থাকে। প্রতিজন স্টাফ যাতে বছরে দুটি ট্রেনিং পায় সেই ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি জানান, বার্ষিক বাজেটের বড় অংশ 'ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং' কোর্সের জন্য ব্যয় করা হয়।

সাজেদা ফাউন্ডেশনে ২০১৮ এর আগে থেকেই 'অফলাইন বেজড সফটওয়্যার' ছিল, পরে ২০২০ সালে 'অনলাইন বেজড সফটওয়্যার' চালু করা হয়। এখন আর মাঠকর্মীদের কাগজের শিট নিয়ে গ্রাহকদের কাছে যেতে হয় না। কর্মীদের সবাইকে স্মার্টফোন দেওয়া হয়েছে। অ্যাপসের মাধ্যমে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। অফিসে বসেই ম্যানেজাররা ফিল্ড কর্মকর্তাদের কাজ তদারকি করতে পারছে। এসব ফোন ক্রয়ের জন্য কর্মীদের সুদমুক্ত ঋণ দেওয়া হয়।

সাজেদা ফাউন্ডেশন ফিল্ড কোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করেছে এতে স্টাফদের মনিটরিং, দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে। শাখা ব্যবস্থাপক মাসে ২০টি সমিতি ভিজিট করে, সদস্যরা কিস্তি দিচ্ছে কি না, তাদের লিখে দেওয়া হচ্ছে কি না, পাশবইয়ের সাথে হিসাবের ঠিক আছে কি না ইত্যাদি তদারকি করা হয়। আরেকটা মডিউল চালু করা হয়েছে যাতে জারিকৃত সার্কুলার কেউ পড়েছে কি না তা যাচাই করা হয়। এখন তো মোবাইলেই এই সার্কুলার যায়। তার ওপরও টেস্ট নেওয়া হয়।

তবে ডিজিটালাইজেশনের ফলে ক্ষুদ্রঋণের যে বিউটি অর্থাৎ 'হিউম্যান টাচ' তা কিছুটা ব্যাহত হবে। কিন্তু তারপরও এই পদ্ধতিতে যথাযথভাবে কাজ করলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টর আরও অধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা করার সুযোগ পাবে।

ইমরুল হাসান

পরিচালক, মাইক্রোফাইন্যান্স
কোডেক

কোডেকের কাজ অন্য সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক আলাদা। আমরা সমুদ্র তীরবর্তী দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে জেলে পল্লীতে কাজ করি। তাদের ভাগ্যের উন্নয়নে আমরা ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যশিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। বর্তমানে আমাদের শাখার সংখ্যা ১২০ এবং এসব শাখা কোস্টাল এরিয়াতে।

আমাদের কার্যক্রমের এক বড় অংশ ডিজিটালাইজড হয়েছে। এতে একসময় ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য বিশাল বিশাল রেজিস্ট্রার রাখতে হতো এখন তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। শুধু চেকবই ইস্যু রেজিস্ট্রার ও ক্যাশ বই আছে। এখন এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিকাশ, নগদ, রকেটের মাধ্যমে গ্রাহকরা কিস্তি পেমেন্ট দিচ্ছে– এতে তাদেরও আসতে হচ্ছে না অফিসে আবার আমাদের কর্মীদেরও যেতে হচ্ছে না। শুধু কিস্তি পরিশোধ না হলে তার কাছে যেতে হয়। ঋণের কিস্তি জমা, ঋণ বিতরণ, সঞ্চয় উত্তোলন হলে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে গ্রাহকরা নিশ্চিত হতে পারেন। কর্মীদের এখন আর কিস্তি শিট নিতে হয় না বা লিখতে হয় না। ল্যাপটপ আপগ্রেড হয়েছে, ডাটা আপগ্রেড হয়েছে। পুরো সিস্টেম এখন স্বচ্ছতার মধ্যে এসেছে। এ ধরনের একটি ব্যবস্থা আমাদের বেসরকারি ক্ষুদ্র উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য যুগান্তকারী ইতিবাচক ভূমিকা রাখার সুযোগ এনে দিয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন ও অফিসিয়াল কার্যক্রমকে সহজ করে দিয়েছে ডিজিটালাইজেশন। কাজ হচ্ছে স্বচ্ছ ও অধিক মানসম্মত।

মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পারাই নগদকে এগিয়ে দিয়েছে

তানভীর এ মিশুক
প্রতিষ্ঠাতা ও
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নগদ

তানভীর এ মিশুক; মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক।
২০১৯ সালে তানভীর এ মিশুক নগদ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বল্প সময়েই পিপিপি অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিরাপদ পার্সন টু পার্সন লেনদেন, তুলনামূলক কম সার্ভিস চার্জ এবং ডাক বিভাগের সম্পৃক্ততার কারণে প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের আস্থার কেন্দ্রে চলে আসে। নগদের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ ডাক বিভাগকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তার নেতৃত্বে নগদ দেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল খাতে ডিজিটাল কেওয়াইসি, সেন্ড মানি টু এনি নাম্বার, ওয়ান ট্যাপ অ্যাকাউন্ট ওপেনিংয়ের মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষে তানভীর এ মিশুকের এই অব্যাহত পথচলা শেষ পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দেয় তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।

প্রত্যয় : ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে নগদের উদ্ভব ঘটেছিল? এ বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

তানভীর এ মিশুক : নগদ যাত্রা করেছে প্রায় সাড়ে চার বছর আগে। তবে তারও দেড়-দুই বছর আগে থেকে আমরা এ নিয়ে কাজ শুরু করি। তখন বেশ কয়েকটি সমীক্ষা করে তবেই আমরা বাজারে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই।

ওই সময় করা সমীক্ষাগুলো থেকে আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার হয় যে, দেশের ৬৫ শতাংশ মানুষ প্রথাগত ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরে তাদের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন করে থাকে। এত বড় একটি জনগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের বাইরে, এটাই আমাদের নগদকে বাজারে নিয়ে আসার মূল জায়গা তৈরি করে দেয়।

ওই সমীক্ষাগুলো করার পর আমরা ভাবলাম যে, দেশের প্রান্তিক মানুষ ও এই ৬৫ শতাংশ মানুষের একটি প্ল্যাটফর্ম থাকা প্রয়োজন, সেই জায়গা থেকে নগদের উদ্ভব।

যথেষ্ট গবেষণা করে বাজারে আসার কারণে যাত্রা শুরুর মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে মোবাইল আর্থিক সেবার বাজারে নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয় নগদ। বাজারে আসার পরপরই অভিনব সব উদ্ভাবন ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমরা জনমানুষের সেবক হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

প্রত্যয় : মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে দেশের মানুষের কাছে নগদ ইতিমধ্যে লক্ষণীয় গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এই গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের পেছনে কোন বিষয়গুলো মুখ্য ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন?

তানভীর এ মিশুক : নগদের জনপ্রিয়তা পাওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো সেবাটি মানুষের প্রয়োজন বুঝতে পারে। অর্থাৎ সাশ্রয়ী সেবা। তাছাড়া সময়োপযোগী উদ্ভাবনও গ্রাহককে আকৃষ্ট করে। যেমন শুরু থেকেই নগদ সেন্ড মানি ফ্রি করেছে। এ ছাড়া ক্যাশ আউট চার্জের ক্ষেত্রেও বাজারে বিদ্যমান সেবার চেয়ে অর্ধেক নিয়ে সেবা দিচ্ছে নগদ। এই বিষয়গুলো মানুষের মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ তৈরি করেছে। তাছাড়া নগদ আরও এমন অনেক সেবা চালু করে যা আগে অন্য কেউ করেনি।

আবার উদ্ভাবনের জায়গায় যদি দেখেন তা হলে দেখবেন দেশে নগদই প্রথম ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে গ্রাহক নিবন্ধন (ই-কেওয়াইসি) চালু করে, যেখানে অ্যাপের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র স্ক্যান করে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এতে কোনো খরচ তো হয়ই না, উপরন্তু মাত্র এক মিনিটেরও কম সময়ে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এই উদ্ভাবনটি বাজারে অনেক বড় ধাক্কা দেয়।

অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে আরেকটি সুবিধা হলো যেকোনো মোবাইল ফোন থেকে *১৬৭# ডায়াল করে মুহূর্তেই নগদ অ্যাকাউন্ট খোলা। দুটি উদ্ভাবনের মাধ্যমেই আট-দশ পৃষ্ঠার ফরম পূরণ করে কয়েক দিন অপেক্ষার হাত থেকে গ্রাহকদের মুক্তি দেয়। ফলে কোথাও কারও কাছে গিয়ে লাইনেও দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। নিজের মোবাইল ফোন থেকে মুহূর্তেই খোলা সম্ভব নগদ অ্যাকাউন্ট।

এসব সুবিধার কারণেই মাত্র সাড়ে চার বছরে নগদের নিবন্ধিত গ্রাহক আট কোটির বেশি। আর দৈনিক গড় লেনদেনও ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা পেরিয়ে গেছে।

প্রত্যয় : পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের সাথে নগদের সম্পর্কটা কি?

তানভীর এ মিশুক : পোস্টালের সাথে সম্পর্কটা হচ্ছে নগদ পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে সাথে নিয়েই ২০১৯ সালে কার্যক্রমটা শুরু করে। পোস্ট অফিসের সাথে আমাদের রেভিনিউ শেয়ারিং হয়, আমরা তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করি এবং আমাদের যে রেভিনিউ হয় সেই রেভিনিউর একটা ভাগ বাংলাদেশ সরকার পায়।

প্রত্যয় : প্রযুক্তির সাথে বাংলাদেশে যারা কাজ করছে তারা কি দ্রুততার সাথে এগোতে পারছে?

তানভীর এ মিশুক : অবশ্যই! গত ১৪ বছরে বাংলাদেশ যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করে উন্নতি করছে সেই একই প্রযুক্তি আমেরিকা, সিঙ্গাপুরসহ অন্যান্য দেশ ব্যবহার করছে এবং আমি বাইরের দেশে কাজ করার সুবাদে এটাও বলতে পারি যে, প্রযুক্তির দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে অনেক নিচে আছে। এমনকি সৌদি আরব, কাতার যেসব টেকনোলজি ব্যবহার করে বাংলাদেশে তার চেয়ে অনেক উন্নত টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। বিষয়টা খুব অবাক লাগলেও এটাই বাস্তবতা। সুতরাং আমি বলতে পারি যে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়েই কাজ করছি, কোথাও পিছিয়ে নেই।

প্রত্যয় : ইতিমধ্যে নগদ এনজিও/এমএফআই সেক্টরের অন্যতম প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের গ্রাহকদের আর্থিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই সম্পৃক্ততার সুফল দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক জীবনকে কতটুকু প্রভাবিত করবে বলে আপনি মনে করেন?

> “নগদের সেবাগুলো এতই গ্রাহকবান্ধব যে সহজেই তারা এটি ব্যবহার করে সুবিধা নিতে পারছেন। তাছাড়া একজন গ্রাহক নগদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সব ধরনের সেবা পায় বলে তিনি তার দৈনন্দিন, মাসিক আয়-ব্যয় হিসাব দেখতে পারেন। যার কারণে একজন সাধারণ গ্রাহক কোথায়, কখন, কীভাবে কত টাকা খরচ করছেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন।

তানভীর এ মিশুক : নগদ সেবা শুরুর পরই প্রান্তিক মানুষ ডিজিটাল আর্থিক সেবার সাথে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। ফলে এখন দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে আর্থিক লেনদেন সেবার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছেন মানুষ। নগদের সাথে এনজিও এবং এমএফআই সেবাগুলোর সম্পৃক্ততা প্রান্তিক মানুষদের আর্থিক সেবার সাথে যুক্ত হওয়ার বিষয়টি আরও নিশ্চিত করছে। এর ফলে নিরাপদ ও সুবিধাজনক উপায়ে আর্থিক লেনদেন করতে পারছেন বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ। তাছাড়া মোবাইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক লেনদেন করার সুবিধা নিয়ে গ্রাহকের সময়ও বাঁচছে অনেক।

পাশাপাশি দেশের বড় একটি জনগোষ্ঠীও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আসতে পারছে। এই অন্তর্ভুক্তির ফলে দেশের অর্থনীতির ভীত শক্তিশালী হচ্ছে। আমাদের চাওয়া ছিল এমনই। আমরা চেয়েছি নগদের মাধ্যমে দেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হোক। মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এই বিষয়টিকে নিশ্চিত করবে।

প্রত্যয় : নগদসহ অন্যান্য MFS প্রতিষ্ঠানগুলো MFI-দের সাথে সেবার সহযোগিতা বিনিময় করছে। এতে গ্রাহকরা সময় ও দূরত্ব সংক্রান্ত সুবিধা ভোগ করছে। MFI-দের সেবা প্রদানে MFS প্রতিষ্ঠানগুলো আর কী কী সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে?

তানভীর এ মিশুক : নগদ মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সময় এবং দূরত্ব কমানোর বিষয়ে সবসময় কাজ করছে। শুরু থেকেই নগদ সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও একটি মানসম্মত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য কাজ করেছে। নগদ শুধু এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান দূর করতেই নয়, পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও ডিজিটালাইজেশন নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্যাশলেস বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে একধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশসহ দেশের অনেক ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় বিগত কয়েক বছরে Process Automation এবং Digitalization প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই দুই প্রক্রিয়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেবাকে কতটুকু টেকসই করে গড়ে তুলতে পারবে বলে মনে করেন? একই সাথে এই সেক্টরের আর কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেতে পারে?

তানভীর এ মিশুক : নগদ একটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) হিসেবে দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন বুরো বাংলাদেশ এবং অন্যান্য সেক্টরের সাথে Process Automation ও Digitalization এর মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করতে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ায় নগদের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী সেবাগুলোর লেনদেন ও ব্যবস্থাপনায় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। এর ফলে সময়, অর্থ ও শ্রম সাশ্রয় করতেও সাহায্য করেছে নগদ। সময়, অর্থ ও শ্রম সাশ্রয়ী হওয়ার কারণে মানুষ নগদের মাধ্যমে সেবা গ্রহণে আগ্রহী। আর এই বিষয়টি মাথায় রেখে আরও কীভাবে মানুষকে সম্পৃক্ত করা যায়, তা নিয়ে কাজ করছে নগদ। যেমন– নগদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে একজন গ্রাহক সহজে ডিপিএস করতে পারবেন, এমন উদ্যোগ নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা আছে। সামনে ডিজিটাল ব্যাংক স্থাপন হলে মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আরও বেড়ে যাবে, তখন নগদ আরও বেশি মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

> বাজারে আসার পরপরই অভিনব সব উদ্ভাবন ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদানের মাধ্যমে আমরা জনমানুষের সেবক হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি।

> আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে যে যার জায়গা থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে, সেই কাজটিই আসলে একসঙ্গে করছে নগদ এবং বুরো বাংলাদেশ।

কোনো ঋণ কিংবা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের জন্য তখন আর গ্রাহককে ব্যাংকে যেতে হবে না। কিংবা কারও কাছে জামানত দিয়ে ঋণের জন্য ঘুরতে হবে না। এ রকম বিভিন্ন সেবা ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারবে নগদ।

প্রত্যয় : এনজিও/এমএফআই খাতের গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেনে অধিকতর ও যুগোপযোগী অন্তর্ভুক্তির জন্য ভবিষ্যতে আর কি কি নতুন প্রোডাক্ট ইনোভেট করার সুযোগ নগদের রয়েছে বলে মনে করেন?

তানভীর এ মিশুক : ইতিমধ্যে নগদ এমএফআইয়ের সাথে কাজ করছে। এমএফআইগুলোর গ্রাহক চাইলে মুহূর্তেই তাদের ইএমআই, ডিপিএসের প্রিমিয়ামসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা মুহূর্তেই সম্পন্ন করতে পারছে নগদের মাধ্যমে। তাছাড়া নির্দিষ্ট এমএফআই নিজেদের মধ্যকার প্রাতিষ্ঠানিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও সহজেই নগদ ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে এখন আর এই সেবার জন্য ব্যাংকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয় না।

নগদ এমন একটি ইকোসিস্টেম দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে, যেখানে একটি প্ল্যাটফর্মে একসাথে সবকিছু পাওয়া সম্ভব হবে বলে আমরা পরিকল্পনা করছি। এই প্ল্যাটফর্মে ক্ষুদ্রঋণ থেকে শুরু করে সঞ্চয় পর্যন্ত করা সম্ভব হবে।

নগদের লেনদেন প্ল্যাটফর্মে এই ধরনের প্রোডাক্ট এবং সেবাসমূহের মাধ্যমে গ্রাহকদের অধিকতর ও যুগোপযোগী অন্তর্ভুক্তি এবং সুবিধা প্রদান করার সুযোগ আছে। এই ইনোভেশন এবং সুযোগগুলো আরও বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহকদের আর্থিক স্বাক্ষরতা এবং ডিজিটাল লেনদেনের স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। এখনই এমএফআইয়ের ডিজবার্সমেন্টগুলো চালু নেই– তবে আমরা আশা করি অল্প সময়েই এটি চালু হবে। সেটি হলে এমএফআইয়ের কার্যক্রমও আরও অনেক গতিশীল এবং সহজ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রত্যয় : আর্থিক স্বাক্ষরতা বা Financial Literacy সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে Informed সিদ্ধান্ত নিতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থিক স্বাক্ষরতার অনুপাত বিবেচনায় ডিজিটাল লেনদেন দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জন্য কতটা নিরাপদ বলে মনে করেন এবং এই আর্থিক স্বাক্ষরতার অনুপাত বৃদ্ধিতে 'নগদ' কীভাবে অধিকতর অবদান রাখতে পারে?

তানভীর এ মিশুক : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও বিচক্ষণতার কারণে আমাদের দেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ডিজিটাল লিটারেসিও বেড়েছে। ফলে দেশের জনগণ সব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আগের চেয়েও অনেক নিরাপদে ব্যবহার করতে পারছে। নগদ সবসময় উন্নত সাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যা গ্রাহকের আমানতকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া নগদের সেবাগুলো এতই গ্রাহকবান্ধব যে সহজেই তারা এটি ব্যবহার করে সুবিধা নিতে পারছেন। তাছাড়া একজন গ্রাহক নগদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সব ধরনের সেবা পায় বলে তিনি তার দৈনন্দিন, মাসিক আয়-ব্যয় হিসাব দেখতে পারেন। যার কারণে একজন সাধারণ গ্রাহক কোথায়, কখন, কীভাবে কত টাকা খরচ করছেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন।

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিষ্ঠান। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করতে গিয়ে আপনার অনুভূতি কি?

তানভীর এ মিশুক : বুরো বাংলাদেশ গত তিন দশক ধরে নিবিড়ভাবে দেশ গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরাও বাংলাদেশকে শক্ত আর্থিক সক্ষমতার ওপরে দাঁড় করাতে কাজ করছি। দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই লক্ষ-কোটি গ্রাহক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এসেছে এবং নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। এটি আমার জন্য খুবই আনন্দের। আমি বিশ্বাস করি, আমরা সবাই মিলে যে যার জায়গা থেকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে, সেই কাজটিই আসলে একসঙ্গে করছে নগদ এবং বুরো বাংলাদেশ। ■

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতেই বুরো বাংলাদেশের ডিএফএস যাত্রা

বিজয় ভৌমিক

সহকারী কর্মকর্তা
ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস

বিজয় ভৌমিক; বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের (ডিএফএস) টিম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ২০১৯ সাল থেকে। তিনি বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত রয়েছেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বুরো বাংলাদেশের যৌথ রেটিং, প্রসেস রেনোভেশন, প্রসেস সিম্পলিফিকেশন, প্রোগ্রাম ও টেকনোলজি ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। বিজয় ভৌমিক আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (AIUB) থেকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বিএসসি ইন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

প্রত্যয় : সাধারণ ভাষায় ডিজিটালাইজেশন ও DFS বলতে কী বোঝায়?

বিজয় ভৌমিক : ডিজিটালাইজেশন মূলত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিক অগ্রগতি। এর অংশ হিসেবে রয়েছে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য অটোমেশন, দৈনন্দিন কাজে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে সংস্থার ব্যপ্তি বৃদ্ধি। ডিএফএস (ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) ডিজিটালাইজেশনের সেই অংশ যেখানে নগদ টাকা ই-মানিতে রূপান্তরিত হয়। এটি রিয়েল টাইম রিয়েলাইজেশন এবং ইউটিলাইজেশনের মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি করে। ডিএফএস সরল এবং সহজলভ্য উপায়ে ডিজিটাল অর্থের মাধ্যমে আরও বেশি গ্রামীণ ব্যাংকবিহীন মানুষকে অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রত্যয় : বুরো বাংলাদেশের ডিএফএস সার্ভিস ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে কীভাবে প্রভাব ফেলছে?

বিজয় ভৌমিক : বুরো বাংলাদেশ শুরু থেকেই তার প্রোডাক্ট ও সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য কাজ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের দারিদ্র্যসীমা ২০১৬ সালে ২৪.৩% থেকে ২০২২ সালে কমে ১৮.৭% এ এসেছে। এখানে ৬% এর মতো কমার পেছনে বাংলাদেশের এমএফআইদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির কথা ভেবেই বুরো বাংলাদেশ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস চালু করেছে।

আজ থেকে ১০ বা ১৫ বছর আগে মানুষের কাছে পর্যাপ্ত সময় ছিল। তাই তারা প্রতি মাসে চারবার সরাসরি কেন্দ্রে এসে নগদ টাকায় লেনদেন করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবস্থা

বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, যেহেতু কর্মক্ষেত্রে অনেক নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণ রয়েছে, সেহেতু সদস্যদের জন্য সরাসরি নগদ লেনদেন করতে আসা অনেকটাই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ ধরনের গ্রাহকদের জন্য ডিএফএস অনেক বড় সুযোগ ও সুবিধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডিএফএস সেবা গ্রহণের মাধ্যমে তারা সহজেই যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে আর্থিক লেনদেন করতে পারছেন এবং বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তিও সময়মতো প্রদান করতে পারছেন। আমরা যে ধরনের গ্রাহকদের সেবা দিচ্ছি তাদের অনেকের নিজের মোবাইল ফোন রয়েছে কিংবা তাদের পরিবারে ন্যূনতম একজন মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী আছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ৯১% মানুষ নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন। এই গ্রাহকদের মধ্যে সবাই ডিএফএস সেবাগ্রহীতা নয়। আমরা শুরুতে চেষ্টা করেছি যারা সাধারণ প্রয়োজনে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করেন তাদের আমাদের এই সেবার অন্তর্ভুক্ত করতে। তারপর আমরা মনোযোগ দিয়েছি যারা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করতেন না, সেসব সদস্যদের দিকে। আমাদের মাঠকর্মীদের সাথে গ্রাহকদের সম্পর্ক ইতিবাচক হওয়ার কারণে তাদের প্রয়োজনটা আমাদের মাঠকর্মীরা সহজেই বুঝতে পারেন। যেসব গ্রাহক আগে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করতেন না, আমরা তাদের এই সেবার উপকারিতা এবং কীভাবে এটি তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে পারে তা বোঝাতে পারছি। আমাদের মাঠকর্মীরা যত্নের সাথে তাদের ডিএফএসের ব্যবহারবিধি শেখাচ্ছে এবং এই সেবায় তাদের অভ্যস্ত করে তুলছে। এমন অনেক গ্রাহক এমএফএস (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস) ব্যবহার করে উপকার পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন লেনদেনে এমএফএস ব্যবহার শুরু করেছেন।

এখন তারা বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান ছাড়াও বিল পেমেন্ট, সেন্ড মানি, মোবাইল রিচার্জসহ ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের নানাবিধ সুবিধা গ্রহণ করছেন। যার ফলে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ও আর্থিক লেনদেনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সেই দৃষ্টিতে বিবেচনা করে আমরা বলতেই পারি যে, বুরো বাংলাদেশের হাত ধরে প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে।

প্রত্যয় : ডিজিটাল লেনদেনকে গতিশীল করতে ও গ্রাহকদের কাছে এর সুফল পৌঁছে দিতে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে?

বিজয় ভৌমিক : ২০১৫ সাল থেকে মেটলাইফ ও মাইক্রোসেভের সহযোগিতায় ডিজিটাল লেনদেন নিয়ে বুরো বাংলাদেশ কাজ শুরু করে। সে সময় অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিভিন্ন কারণে ডিজিটাল লেনদেনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সব শাখায় শুরু করা সম্ভব হয়নি। সব জায়গায় এজেন্ট পয়েন্ট না থাকা, মানুষের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে ধারণা না থাকা, দৈনন্দিন কাজে ডিজিটাল লেনদেনের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব ও ডিজিটাল লেনদেনে মানুষের ভীতি এর মধ্যে অন্যতম কারণ। এছাড়াও তো এই সেবাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য আমাদের সংস্থার সিস্টেম ক্যাপাসিটি সেই সময় বর্তমানের মতো আধুনিক ছিল না। বুরো বাংলাদেশ যেকোনো প্রোডাক্ট বা সেবা চালু করার আগে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে সক্ষমতা পর্যালোচনা করে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস শুরু করার জন্য সে সময় যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল। যেমন– বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি হিসাব অনুযায়ী সদস্যদের ইউনিক আইডি ছিল না এবং ডিএফএস প্রোভাইডারের সাথে রিয়েল টাইম API ছিল না, যার ফলে সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্য ও সদস্যের হিসাব চিহ্নিতকরণ ও তাৎক্ষণিক যাচাই করে ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য সফটওয়্যারে সংযুক্তিকরণ সম্ভবপর ছিল না। এ ব্যাপারগুলো আমরা সমাধান করতে পেরেছি ২০১৯-এ যখন বিকাশের সাথে কার্যক্রম শুরু করি। সে সময় শুরু থেকেই সদস্যরা রিয়েল টাইম API ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব যাচাইকরণ সম্পন্ন করে বুরো বাংলাদেশে যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে ডিজিটাল লেনদেন সম্পন্ন করতে পারতেন। কিন্তু সেই সময় আমরা যেহেতু রিয়েল টাইম API এর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছি সেহেতু দুটি সিস্টেম শতভাগ সময় অনলাইনে না থাকলে অর্থাৎ বুরো অথবা ডিএফএস প্রোভাইডার যে কারও সিস্টেম সক্রিয় না থাকলে সদস্যদের লেনদেনকৃত টাকা 'ফ্রিজ' হয়ে যেত। লেনদেন ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে সেই টাকাটা সদস্যও ব্যবহার করতে পারতেন না বা বুরো বাংলাদেশের হিসাবেও যুক্ত হতো না এবং এই টাকা ৭২ ঘণ্টা পরে সদস্যের কাছে ফেরত যেত। এই ধরনের প্রক্রিয়ার কারণে অনেক গ্রাহক ডিএফএস ব্যবহার করতে ভয় পেত বা অসন্তুষ্টি তৈরি হচ্ছিল। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য আমরা সিস্টেমে Retry Mechanism ব্যবহার শুরু করি। অর্থাৎ কোনো কারণে কোনো একটি সিস্টেমের সমস্যার জন্য কোনো লেনদেন সম্পূর্ণ না হলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে আসার পর পুনরায় চেষ্টা করে লেনদেনটি সফল করে। এর দ্বারা এই 'ফ্রিজিং' বিষয়ক সমস্যার সমাধান হয় এবং কোনো কারণে সিস্টেম ডাউন থাকলে লেনদেনটি পরবর্তীতে সম্পন্ন হয়।

আমরা মানুষ হিসেবে পরিবর্তন অনিবার্য জেনেও তা মেনে নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। কিন্তু এগিয়ে যেতে আমাদের পরিবর্তন প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড এমএফএস অ্যাকাউন্ট ১৯.৮ কোটি রয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এই মোতাবেক বলা যায়, বর্তমান বাংলাদেশে অনেক মানুষ ডিজিটাল লেনদেন করছেন। কিন্তু তারপরও এখনও অনেক মানুষ আছেন যারা ডিজিটাল লেনদেন করতে ভয় পান বা সঠিক পদ্ধতিতে ডিজিটাল লেনদেনের সক্ষমতা নেই। এটি সমাধানের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ সারা দেশে কর্মরত ৯ হাজারের বেশি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের ডিজিটাল লেনদেন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং সংস্থার এই প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমেই বুরো বাংলাদেশের সদস্যগণ ডিজিটাল লেনদেনের প্রক্রিয়া, সাহস ও উৎসাহ অর্জন করেন। ২০১৯ থেকে শুরু করে এ যাবৎ সংস্থার ১৪ লক্ষ সদস্য ন্যূনতম একবার তাদের বুরো বাংলাদেশের যেকোনো হিসাবে লেনদেন করেছেন এবং প্রতি মাসেই দুই থেকে আড়াই লক্ষ সদস্য নিয়মিত লেনদেন করে থাকেন। বিগত নভেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত সংস্থার সদস্য প্রায় ২ কোটি লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ২৬৬৫ কোটি টাকা ডিজিটালি প্রদান করেছেন।

এছাড়াও সদস্যদের ডিজিটাল লেনদেন না করার একটা মুখ্য কারণ হলো, ডিজিটাল লেনদেন করতে ডিএফএস প্রোভাইডারদের জন্য প্রযোজ্য একটি চার্জ লেনদেনের সময় ডিএফএস প্রোভাইডার কর্তৃক কর্তন করা হয়। বুরো বাংলাদেশ এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে সব মাঠকর্মীকে গ্রাহক পর্যায়ে ডিজিটাল লেনদেনের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করার বিষয়টি প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সদস্যদের মধ্যে তা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। এছাড়াও সংস্থা হিসেবে এমএফএস সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শুরু থেকেই কম খরচে লেনদেনের কার্যক্রম শুরু করে, যা প্রতি হাজারে ১০ টাকা। পরবর্তীতে আরও সমঝোতা ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে এই খরচ কমিয়ে বর্তমানে প্রতি হাজারে ৯.৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ১৫০ টাকায় নিয়ে আসা হয়েছে, যা গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেনে অনেকাংশে উৎসাহিত করছে। এছাড়াও শুরুর দিকে একজন সদস্যের যদি সংস্থায় একের অধিক অ্যাকাউন্ট থাকত, সেক্ষেত্রে তাকে প্রতিটি হিসাবের জন্য আলাদা আলাদা করে লেনদেন করতে হতো। যা সদস্যদের জন্য অনেক সময়সাপেক্ষ বিষয় ছিল এবং এটি সদস্যদের অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুরো বাংলাদেশ পরবর্তীতে ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে 'ওয়ান শট' পদ্ধতি চালু করে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি অ্যাকাউন্টে পুরো টাকা জমা দিলে সফটওয়্যারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সদস্যের সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রদেয় অনুযায়ী টাকা জমা করে থাকে। এর ফলে সদস্যদের জন্য লেনদেনের সময় যেমন কম লাগছে, সেই সাথে ডিজিটাল লেনদেনের প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে। ■

বুরো বাংলাদেশের ডিএফএস টিম

বুরো বাংলাদেশের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন টিম

ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সর্ভিসেস

এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন

শাহ্ আলম

২০১৫ সাল থেকে বুরো বাংলাদেশ তার সদস্যদের জন্য শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় নিরাপদে অতিদ্রুত ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন কার্যক্রম ডিজিটালি সম্পন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের একটি অনন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রায় সব শাখা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের আওতাভুক্ত হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধরনের সদস্য নিয়মিতভাবে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিভিন্ন সুবিধা ভোগ করছে।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেন আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। মানুষ তাদের প্রযুক্তিভীতি ও চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অভ্যস্থ হতে শুরু করেছেন। আগে যেখানে মোবাইলে কল ধরতেই ভয় পেতেন, এখন সেখানে নিয়মিত বুরো বাংলাদেশের সাথে আর্থিক কার্যক্রম সম্পন্নের পাশাপাশি অন্যান্য ডিজিটাল সুবিধা যেমন মোবাইল রিচার্জ, ফান্ড ট্রান্সফার ইত্যাদি কার্যক্রম অনায়াসে করছেন। এতে করে দৈনন্দিন কাজে অনেক সময় সাশ্রয় হওয়াসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক শ্রম লাঘব হচ্ছে। মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে ডিজিটালি তাদের সঞ্চয় জমার পরিমাণ ও ঋণ স্থিতি দেখতে পাওয়ার ফলে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বনির্ভর হতে শুরু করেছেন।

একটা সময় ছিল যখন কেন্দ্রে এসে সদস্যদের অনেক সময় ব্যয় করতে হতো। ফলে তাদের গৃহস্থালির কাজে যেমন ব্যাঘাত ঘটত, তেমনি সময়মতো পরিবারের জরুরি কাজ শেষ না করায় পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হতো। অন্যদিকে প্রদত্ত টাকা সঠিকভাবে জমা হলো কি না তা নিয়ে দ্বিধার সৃষ্টি হতো। অনেকে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে কিস্তির টাকা প্রদান করা নিয়ে চিন্তায় থাকতেন। দূরবর্তী বাজারে গিয়ে কর্মীর ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বরে ক্যাশ আউটের খরচসহ টাকা পাঠিয়ে দিতেন। ফলে তাদের অনেক বাড়তি টাকা খরচ হতো। পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য এ সমস্যা আরও প্রকট। এখন সদস্য চাইলে ডিজিটালি যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে অতিদ্রুত কম খরচে সহজে ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা বুরো বাংলাদেশে

> বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস যেন এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন! এখন তারা ইচ্ছে করলে ক্যাশ আউট না করেই বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি প্রদানসহ সব টাকা ব্যাংকের মতো বুরো বাংলাদেশের সাধারণ সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখতে পারেন।

তার নিজের অ্যাকাউন্টে নিজেই পাঠাতে পারেন। বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস যেন এক স্বপ্নের বাস্তবায়ন! এখন তারা ইচ্ছে করলে ক্যাশ আউট না করেই বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি প্রদানসহ সমস্ত টাকা ব্যাংকের মতো বুরো বাংলাদেশের তাদের সাধারণ সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখতে পারেন। জরুরি কাজ ফেলে সময় ও অর্থ ব্যয় না করে এখন চাকরিজীবী সদস্যসহ যেকোনো সদস্য, যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় নিরাপদ ও দ্রুততার সাথে বুরো বাংলাদেশে ডিজিটাল লেনদেন করতে পারেন। সদস্যদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের শাখা পর্যায়ের কর্মীদের কাছেও ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস যেন এক আশীর্বাদস্বরূপ! একজন মাঠ কর্মী প্রতি সপ্তাহে একই পথ ধরে একই জায়গায় সদস্যের ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা আদায় করতে যান এবং সারা দিনের আদায় শেষে অনেক টাকা নিয়ে একই পথ ধরেই ফিরে আসেন। এতে করে টাকা ছিনতাই ও হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা তো ঘটেই, অন্যদিকে অজান্তে জাল ও ছেঁড়া টাকা আদায়ের ফলে নিয়মিত গচ্ছা দিতে হয়। আবার আদায়কৃত টাকা পোস্টিংজনিত ভুল হওয়ায় অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তমজুদের ফলে চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ডিজিটাল মাধ্যমে যদি বেশিরভাগ সদস্যদের টাকা আদায় হয় তা হলে উল্লেখিত সব সমস্যার সমাধান হয়ে চাকরি ক্ষেত্রে সফলতা ধরা দেবে। অন্যদিকে ডিজিটালি আদায়কৃত টাকা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের সফটওয়্যারে পোস্টিং হওয়ার পাশাপাশি শাখার ব্যাংক হিসাবে জমা হয়ে যায়। ফলে শাখা হিসাবরক্ষকের কাজের চাপ অনেকাংশে লাঘব হওয়ার পাশাপাশি শাখার দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন রিপোর্ট স্বচ্ছ ও সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। ফলে শাখা ব্যবস্থাপকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের দ্রুত, সহজতর ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ডিএফএস অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টর সমাজের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করে। বুরো বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রযুক্তিভীতি দূর করে এবং চিরাচরিত অভ্যাস পরিবর্তন করে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন আন্তরিকতা, ধৈর্য, অটুট লক্ষ্য এবং পরিশ্রম। আমরা বুরো বাংলাদেশের সব কর্মীই উন্নয়ন কর্মী হিসেবে এই দুরূহ কাজটিই করে চলেছি দিনের পর দিন। আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এক দিন ডিজিটাল ব্যবস্থায় অভ্যস্থ হয়ে উঠবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। ■

● ম্যানেজার- ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস
বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, বুরো বাংলাদেশ।

মনীষা সেতু হাজং

পাহাড়ের জীবন সহজ করছে ডিএফএস

শহরের সাথে দূরত্ব, যানবাহনের সংকট, যাতায়াতে দীর্ঘ সময় ও অর্থ ব্যয়- সর্বোপরি দুর্বল যোগাযোগব্যবস্থা দুর্গম এলাকার মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় এক প্রতিকূলতা হয়ে রয়েছে। আর্থিক সেবা গ্রহণে এ ধরনের বাধা থাকায় এসব অঞ্চলে বসবাস করা মানুষজন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হওয়া থেকে পিছিয়ে পড়ছেন, শুধু মূলধন সংগ্রহ ও তৈরির সুবিধা বা পরিবেশ না পাওয়ায়। এসব দুর্গম এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে আর্থিক সেবা সহজলভ্য উপায়ে পৌঁছে দিতে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস চালু করেছে বুরো বাংলাদেশ। ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে বুরোর আর্থিক সেবা গ্রহণকারী এমনই একজন সদস্য কাঞ্চনমুখী তঞ্চঙ্গ্যা।

বান্দরবান শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে রোয়াংছড়ির দুর্গম এক পাড়া– বিগনশেনে ছোট ছোট দুই ছেলে নিয়ে বসবাস করেন কাঞ্চনমুখী তঞ্চঙ্গ্যা। পেশায় তিনি একজন কৃষক। কাঞ্চনমুখীর স্বামী বাংলাদেশ আনসার বাহিনীতে চাকরি করেন। বর্তমানে কর্মসূত্রে তিনি বসবাস করেন নোয়াখালীতে। স্বামী অন্যত্র চাকরিরত থাকায় ছোট ছোট দুই সন্তানের সব দায়িত্ব কাঞ্চনমুখীকে একাই পালন করতে হয়। মা হিসেবে তার দিনের অনেকটা সময় কাটে দুই ছেলের দেখাশোনাতে। কাঞ্চনমুখীর বড় ছেলের বয়স ৭ বছর। স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসার কাজ কাঞ্চনমুখী নিজেই করেন। এই পুরোটা সময় কোলে থাকে তার ছোট ছেলে। কারণ, এত ছোট ছেলেকে বাড়িতে একা রেখে যাওয়ার সুযোগ নেই। ছোট ছেলের বয়স ২ বছর। দুই ছেলেকে বড় করার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের পাশাপাশি পাহাড়ে নিয়মিত জুম চাষ করে থাকেন তিনি। বছরের বিভিন্ন সময় ঋতুভেদে ফসল ও শাকসবজির চাষ হয় তার জমিতে। কঠোর পরিশ্রমী এই নারীর অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল আবাদি জমির পরিমাণ বাড়িয়ে কৃষিকাজের পরিসর বাড়ানো। তবে জমি কেনার মতো যথেষ্ট টাকা কাঞ্চনমুখীর হাতে ছিল না। তারপরও কাঞ্চনমুখী পিছপা হননি। নিজের লক্ষ্যে এগোতে সহায়তা নিয়েছেন বুরো বাংলাদেশের কাছ থেকে।

২০২৩-এর শুরুতে কাঞ্চনমুখী বুরো বাংলাদেশের 'বান্দরবান এসএমই' শাখার সদস্য হন। কৃষিকাজের পরিসর বাড়াতে বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে, সেই টাকা দিয়ে পাহাড়ে জমি কেনেন কাঞ্চনমুখী। এই জমিতে ভুট্টা, জুম ধান, আদা ও বিভিন্ন শীতকালীন সবজি চাষ হয়। পাশাপাশি বাড়ির আঙিনায় করেছেন পশু-পাখির ছোট একটি খামার। পরিবারের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি তিনি তার উৎপাদিত জুমের ধান, সবজি ও খামারের হাঁস-মুরগি স্থানীয় বাঘমারা বাজারে বিক্রি করে থাকেন। এতে যেটুকু আয় হয়, সেটুকু অর্থ বুরোতে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যবহার করেন। প্রথম দিকে টাকা জমা দিতে দীর্ঘ সময় ও অর্থ ব্যয় করে তিনি প্রতি মাসে বান্দরবান শহরে আসা-যাওয়া করতেন। বান্দরবান শহরে যাওয়া-আসার জন্য প্রতিবার গাড়ি ভাড়া হিসেবে ২০০ টাকা খরচ হতো কাঞ্চনমুখীর। তাছাড়া বান্দরবান শহরে একবার যাওয়া-আসা করতে গেলে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়। পাহাড়ি পথ দুর্গম হওয়ায় এত দূরের যাত্রায় ছোট শিশুদের সাথে

কাঞ্চনমুখী তঞ্চঙ্গ্যা
স্বামী: রূপন তঞ্চঙ্গ্যা
শাখা : বান্দরবান
কেন্দ্র-২০৫০
সদস্য নং- ৩২৪৫

নিয়ে যাওয়া কিংবা বাড়িতে একা রেখে যাওয়া কোনোটাই নিরাপদ নয়। অন্যদিকে এলাকা দুর্গম হওয়ায় সবসময় যানবাহনও পাওয়া যায় না। এত কিছুর মধ্যে বাড়িতে রেখে যাওয়া সন্তানদের জন্য দুশ্চিন্তা ও যাত্রার ক্লান্তি যেন ছিল সঙ্গে বাড়তি দুর্ভোগ হিসেবে।

যেখানে ঘরের কাজ, মাঠের কাজ ও ছেলে দুটিকে স্কুল আনা-নেওয়া আর দেখাশোনার কাজেই সকাল থেকে রাত গড়িয়ে যায়; সেখানে এসব বিষয় দৈনন্দিন কাজে বিঘ্ন তৈরি করছে বলে কাঞ্চনমুখীর মনে হয়। আর এই দুর্ভোগের কথা যখন বুরোর কর্মসূচি সংগঠককে জানান, দুর্ভোগ কাটিয়ে ওঠার সহজ ও সাশ্রয়ী এক পন্থা জানানো হয় তাকে। তবে শুধু জানানোর মধ্যেই বুরোর কর্মসূচি সংগঠকের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সাথে এই পন্থার সাথে কাঞ্চনমুখীকে পরিচয় ও শিখিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করে বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি সংগঠক।

তার দুর্ভোগের সুন্দর একটি সমাধান পেয়ে বেজায় সন্তুষ্ট কাঞ্চনমুখী। পুরো অভিজ্ঞতাটি কাঞ্চনমুখীর ভাষায়, 'বুরোর কর্মী ভাইকে যখন আমার সমস্যার কথা জানাই, তখন তিনি আমাকে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন সুবিধা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। তিনি আমাকে মোবাইল ব্যবহার করে কিস্তি ও সঞ্চয় জমা দেওয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন। প্রথমদিকে যদিও একা ঠিকঠাকভাবে মোবাইল দিয়ে কিস্তি জমা দিতে পারবো, এমন সাহস পেতাম না। কিন্তু কর্মী ভাইটি বেশ কয়েকবার নিজে পাশে থেকে শিখিয়ে দেওয়ায় এখন ডিজিটাল লেনদেনে সাহস পাই। কিস্তি ও সঞ্চয় নিয়মিত মোবাইল দিয়েই জমা করছি।' কাঞ্চনমুখী আরও বলেন, 'আমি যে টাকা জমা করছি, সেটা ঘরে বসেই আমার অ্যাকাউন্টে জমা হতে দেখি। এতে এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ হয়। টাকা জমা দেওয়ার পদ্ধতিটাও সহজ। সবমিলিয়ে কত টাকা জমা দিতে চাচ্ছি সেই পরিমাণ লিখে দিলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার কিস্তি ও সঞ্চয় অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাচ্ছে। বারবার আলাদা করে কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা জমা দিতে হচ্ছে না।'

কাঞ্চনমুখী তঞ্চঙ্গ্যা মনে করেন, বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি তার জন্য খুব সহজ, লাভজনক ও নিরাপদ। এতে করে তার বান্দরবান শহরে যাওয়া-আসার প্রায় দুই ঘণ্টা সময় ও ২০০ টাকা গাড়ি ভাড়া বেঁচে যায়। তাছাড়া বাড়িতে ছোট বাচ্চাদের একা রেখে যেতে না হওয়ায় তাকে দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় না। অন্যদিকে তার স্বামী মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে বাড়িতে যে টাকা পাঠান, সেই টাকা ক্যাশ-আউট না করে সরাসরি তার ঋণ ও সঞ্চয় হিসাবে পাঠিয়ে দিতে পারছেন। কারণ বুরোর ডিএফএস সেবার ফলে সদস্যদের কিস্তি ও সঞ্চয় বিকাশ/নগদের মাধ্যমে জমা দিতে সর্বনিম্ন ১০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা খরচ হয়। এটি কাঞ্চনমুখীর কাছে লাভজনক হওয়ায় তিনি তার স্বামীর পাঠানো টাকা ক্যাশ-আউট না করে সরাসরি ঋণ ও সঞ্চয় হিসাবে পাঠিয়ে দেন।

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কর্মসূচির আওতায় এভাবেই মূলধারার ব্যাংকিং সেবা থেকে বঞ্চিত অনেক কর্মব্যস্ত নারী-পুরুষ সহজলভ্য উপায়ে আর্থিক সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই যে সাধারণ মানুষরা অবদান রাখছেন, তাদের কাছে মানসম্পন্ন আর্থিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকেই বুরো বাংলাদেশের এই উদ্যোগ। লাখ লাখ সদস্যই বুরো বাংলাদেশের প্রেরণা। ডিএফএসের কল্যাণে এখন একজন সদস্য মোবাইল ফোনে কয়েকটি ট্যাপের মাধ্যমে দেখতে পারছেন, তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা জমা আছে। যা এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ তৈরি করছে সদস্যের মনে। কম খরচে এই ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে বুরো বাংলাদেশ। এখানে প্রতিটি লেনদেন স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল হয় এবং সদস্যদের তথ্য সুরক্ষিত রাখা বা কোনো ধরনের ঝুঁকি যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়। এতে সাধারণ মানুষকে যেমন ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত করা সম্ভব করা হচ্ছে, তেমনি দুর্গম এলাকার মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা যাচ্ছে। কাঞ্চনমুখী তঞ্চঙ্গ্যা তার এক প্রকৃত উদাহরণ। ■

● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন, বুরো বাংলাদেশ

ফারুক আহামেদ

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম দক্ষিণ অঞ্চল

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের দুর্গম অঞ্চলের জনগণের জীবনযাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। বাংলাদেশের এই অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে তথ্যপ্রযুক্তির সম্প্রসারণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দুর্গম এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাচীন পেশা কৃষি হলেও আধুনিক যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন পেশা বর্ধিত হচ্ছে। শহরাঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে সেই তুলনায় দুর্গম অঞ্চলের জনগণের সুযোগ-সুবিধা খুবই সামান্য। সে জন্য এই অঞ্চলের জনগণের আর্থিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তারা বর্তমানে এই মাধ্যম ব্যবহার করে ছেলেমেয়েদের স্কুলের বেতন-ভাতা প্রদান, সরকারি উপবৃত্তি গ্রহণ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ভূমি উন্নয়ন কর, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল, মোবাইল রিচার্জ ইত্যাদি লেনদেন ঘরে বসে করে থাকে। এছাড়া তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এই মাধ্যমে মেয়াদি সঞ্চয়সহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি লেনদেন করে থাকে। ডিজিটাল লেনদেনের সুবিধা পাওয়ার কারণে এই অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলার থানচি, শোয়ালক, বাঘমারা, রোয়াংছড়ি, কানাপাড়া, রুমা ও আলীকদমে বুরো বাংলাদেশের অনেক সদস্য রয়েছেন। ওই সব এলাকার সদস্যরা ঋণ ও সঞ্চয় সেবা গ্রহণের সময় তাদের হাতে-কলমে ডিজিটাল মাধ্যমে কীভাবে সঞ্চয় ও কিস্তি জমা দেওয়া যায় তা শিখিয়ে দেওয়া হয়। সদস্যের আবাসস্থল থেকে অফিসে এসে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা করতে অর্থ ও সময় দুটোই বেশি লাগে। তাই ওই সব সদস্যরা সহজেই ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে টাকা জমা দিয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাংকিং সুবিধা কম থাকায় সমতলে যারা চাকরি বা ব্যবসা করেন তারা বুরো বাংলাদেশ ডিজিটাল ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পরিবারে খরচের টাকা পাঠিয়ে থাকেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডিজিটাইলাজেশনের ফলে দুর্গম অঞ্চলের উন্নয়ন এভাবে চলতে থাকলে সমতলের মানুষের মতো এই অঞ্চলের জনগণও একসময় একই কাতারে আসবে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বুরো বাংলাদেশ দুর্গম অঞ্চলের অবহেলিত মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটাল যাত্রায় আইসিটি বিভাগ

শাহিনুর ইসলাম
কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, আইসিটি

নব্বই দশকের শুরুতে প্রতিষ্ঠার সময়কাল থেকেই বুরো বাংলাদেশ কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম যেমন MS-DOS, Lotus, Windows-95 ব্যবহার করে ডিজিটাল কার্যক্রম শুরু করে। নব্বই দশকের শেষ সময় থেকে আমাদের এই সংস্থা কাস্টমাইজড পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (PMIS) এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সিস্টেম (FIS) সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় জড়িত। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালে সংস্থা সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক এবং কম্পিউটার সিস্টেম বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করে। অগ্রাধিকার হিসেবে সংস্থা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সদস্য জরিপ, ভর্তি, ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন, বিতরণ, কিস্তি আদায়, সঞ্চয় উত্তোলন, আদায় বিবরণী ও সব রিপোর্ট তৈরির ম্যানুয়াল পদ্ধতি ডিজিটাইজেশন এবং ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার সফল পরিণতি ঘটে ২০০৮ সালে একটি সমন্বিত মাইক্রোফাইন্যান্স সলিউশন তৈরি করার মাধ্যমে। পাশাপাশি স্থায়ী সম্পদের রেকর্ড সন্নিবেশিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী সম্পদ রেজিস্ট্রার (FAR) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। একইভাবে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা-পরিষেবা ব্যবস্থাপনা ও তদারকির প্রয়োজনে একটি পারদর্শী আইটি টিম প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইটি টিম সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের বাইরেও কর্মীদের তথ্যপ্রযুক্তি সংবলিত প্রশিক্ষণ প্রদান, সফটওয়্যার ব্যবহারকারীর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা (UAT), সফটওয়্যার পরীক্ষা (QA) এবং ডিবাগিংয়ের মতো কাজগুলোকে আইটি টিমে অন্তর্ভুক্ত করে। ২০০৮ সালের পর মাইক্রোফাইন্যান্স অফলাইন সফটওয়্যারটি ক্রমান্বয়ে সব শাখায় চালু করতে সক্ষম হয় এবং ওই সময়ে বহুল ব্যবহৃত উইন্ডোজভিত্তিক ব্যক্তিগত ডিজিটাল সহকারী (PDA) ডিভাইস ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্র/সমিতি কালেকশনের উপযোগী এবং কর্মীবান্ধব একটি অফলাইন অ্যাপস ডেভেলপ করে ৫টি শাখায় ব্যক্তিগত ডিজিটাল সহকারীর (PDA) মাধ্যমে কেন্দ্র কালেকশনের পাইলটিং সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে তথ্যপ্রযুক্তির রূপান্তরের সাথে তাল মিলিয়ে বুরো বাংলাদেশ কৌশলগতভাবে অফলাইন সফটওয়্যার, অ্যাপসের অনলাইন সংস্করণের কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশের সিস্টেমগুলো নির্বিঘ্নে একত্রীকরণ, ডেটা সুরক্ষা ও দক্ষ জনবল তৈরির উদ্দেশ্যে নিজস্ব স্থাপনায় ডেটা সেন্টার (টায়ার-৩) স্থাপন করে। উপরন্তু আইসিটি বিভাগের কাজের পরিধি বিবেচনায় টিম ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ডাটা সেন্টার ব্যবস্থাপনা, নেটওয়ার্ক এবং সাইবার সিকিউরিটি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং সিস্টেম সাপোর্ট টিম গঠন করে তথ্যপ্রযুক্তি সেবা উন্নত করা হয়। সংস্থার আইটি টিমের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ২০১৬-১৭ সালে এরূপ দূরদর্শী উদ্যোগগুলো সংস্থার ডিজিটাল কর্মপ্রবাহের আধুনিকীকরণের পথ সুগম করে। ফলস্বরূপ, বুরো বাংলাদেশের আইটি বিভাগ ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে অফলাইন সফটওয়্যার এবং অ্যাপসগুলো অনলাইনে রূপান্তর করেছে। এছাড়া কোর মাইক্রোফাইন্যান্স সলিউশনের মাধ্যমে সংস্থার সব শাখার কর্মীরা অ্যাপস ব্যবহার করে ট্যাবের মাধ্যমে রিয়েলটাইম ট্রানজেকশন করছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সে প্রেক্ষিতে ডিজিটাল লেনদেনের বিষয়টি অগ্রগণ্য চাহিদা বিবেচনায় ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (DFS) টিম গঠন করা হয়, টিমটি কর্মসূচি বিভাগ এবং আইসিটি টিমের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বুরো বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযোগী মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) মডেল তৈরি করে সফলতার সাথে সব শাখায় পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রতি মাসে সঞ্চয় ও ঋণের প্রায় ১০% এমএফএসের (MFS) মাধ্যমে আদায় হচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বুরো বাংলাদেশ ২০১৭ সাল থেকে আইসিটি বিভাগ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় একাধিক সফটওয়্যার তৈরি করেছে এবং সংস্থার সব ম্যানুয়াল পদ্ধতি অটোমেশনের আওতাভুক্ত করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ই-ফাইল নামক সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব কর্মীর পারসোনাল ফাইল সফটকপিতে রূপান্তর করে পেপারলেস ইনিশিয়েটিভের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে। এছাড়াও ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট, রিভলভিং লোন ফান্ড, বাৎসরিক কর্মী মূল্যায়ন, এইচআরএম অ্যান্ড পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড অ্যান্ড গ্র্যাচুইটি, সেবা ও সরবরাহ, রেমিট্যান্স সংক্রান্ত লেনদেন, বুরো হেলথ কেয়ার সার্ভিস ও ছুটিসহ সংস্থায় ১৫টি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। আইসিটি বিভাগ চলতি বৎসর নিরীক্ষা বিভাগের জন্য সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা সংস্থার এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিংয়ের (ERP) অংশবিশেষ। পাশাপাশি সংস্থার সব কর্মী ইন্টারনেট সেবা ভোগ করছে। স্তরভেদে দুই হাজারের বেশি কর্মী ল্যাপটপ ব্যবহার করছে। এই পুরো যাত্রাজুড়ে ডেটা নিরাপত্তা এবং পরিষেবার প্রাপ্যতা সম্পর্কে গভীর সচেতনতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যা আমরা বিশ্বাস করি। পাশাপাশি ডেটা নিরাপত্তা, সিকিউরড কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করতে Endpoint Securityসহ আধুনিক প্রযুক্তি সংবলিত নেক্সট জেনারেশন ফায়ারওয়াল এবং মনিটরিংয়ের জন্য একাধিক সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্যই নয় বরং উদ্ভাবনের অগ্রভাগে অবস্থান করার জন্য সংস্থা ক্রমাগত উদীয়মান এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা পরিমাপযোগ্যতার উদ্বেগগুলোকে অধ্যবসায়ের সাথে সমাধান করছি। বুরো বাংলাদেশ সাইবার সিকিউরিটি এবং আইটি সার্ভিসের জন্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করে থাকে, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষা করানো হয়। বুরো বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, ডেটা অ্যানালিটিক্স হলো সমসাময়িক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) প্রক্রিয়াগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা বিভিন্ন উদ্ভাবন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম উৎস। ডেটা সেটগুলোর পদ্ধতিগত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি বের করতে পারে, নিদর্শনগুলো উন্মোচন করতে পারে এবং ডেটাচালিত সিদ্ধান্ত নিতে ভূমিকা রাখে। উল্লেখিত প্রয়োজনীয়তায় ২০২২ সালে বুরো ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং গবেষণা ও উন্নয়ন নামে দুটি টিম তৈরি করে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি আইসিটি বিভাগ সাইকোমেট্রিক, ক্রেডিট স্কোরিং এবং ক্যাশ-ফ্লো অ্যানালাইসিস নিয়েও কাজ করছে। সর্বোপরি বিশ্বে যেখানে পরিবর্তনই একমাত্র ধ্রুবক, বুরো বাংলাদেশ ব্যবসায়িক কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির এরূপ প্রভাবকে স্বীকৃতি দিয়ে দক্ষতা প্রদর্শন করছে। ফলশ্রুতিতে বুরো বাংলাদেশ আর্থিক প্রক্রিয়াগুলোকে সুগম করেছে, নির্ভুলতা এবং দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের জনবলের দক্ষতা উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন করতে যেমন নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তেমন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গ্রাহক এবং কর্মী উভয়ের জন্য ডিজিটাল কর্মপরিবেশ তৈরিতে ইতিবাচক সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপও নিয়ে থাকেন।

আইসিটি বিভাগের মোট কর্মী ১১০ জন

কর্ম এলাকা

প্রধান কার্যালয়
বিভাগ ৯
অঞ্চল ৩৭
এলাকা ২৮১
শাখা ১৩৯২
সিএইচআরডি ১০

ডিজিটাল যাত্রা

ডেটা সেন্টার
শাখার অনলাইন অটোমেশন
সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট
ট্যাবের মাধ্যমে কালেকশন
ডিএফএস কালেকশন
ক্লাউড স্টোরেজ

ডিজিটাল যাত্রার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

ডেটা অ্যানালিটিক্স
অভ্যন্তরীণ সফটওয়্যার উন্নয়ন
পরিপূর্ণ ডিজিটাইজেশন
ইআরপি সিস্টেম ইমপ্লিমেন্টেশন

আলী রেজা, কর্মকর্তা– আইসিটি

আগে একজন কর্মীকে আদায় বিবরণী লিখতে দীর্ঘ সময় ধরে কঠোর শ্রম ব্যয় করতে হতো, যা এখন শুধুই অতীত। সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে মাঠ পর্যায়ে আদায় শেষে শাখায় ফিরেই প্রতিদিনের কাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে, অল্প সময়ে নির্ভুল রিপোর্ট প্রস্তুত সম্ভব হচ্ছে। আগে প্রধান কার্যালয়ে মাসের কনসলিডেটেড রিপোর্ট প্রস্তুতিতে ২০-২৫ দিন সময় লাগত, যা সফটওয়্যার ব্যবহার করে এখন ৩-৪ দিনের মধ্যেই সম্ভব হচ্ছে এবং তথ্যগুলোও বেশ নির্ভরযোগ্য হচ্ছে। সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে স্টেকহোল্ডারদের (সরকারি-বেসরকারি) চাহিদা মতো রিপোর্ট প্রস্তুতিতে আগের মতো আর বেগ পেতে হয় না এবং যথাসময়ে রিপোর্ট প্রদানে কোনো জটিলতা তৈরি হয় না। এখন চাইলেই সংরক্ষিত যেকোনো সময়ের যেকোনো তথ্য আমরা কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে দেখতে পাই। এমআইএস টিমের মাধ্যমে সফটওয়্যারে সংরক্ষিত তথ্যগুলো নানাভাবে বিশ্লেষণ করে ম্যানেজমেন্ট সহজেই ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন ডিজিটালাইজেশনের জন্য।

সাখাওয়াত হোসেন, সহকারী কর্মকর্তা– আইসিটি

যেকোনো সংস্থার জন্য ডেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করে যা সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে সঠিক ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। ডিজিটালাইজেশনের যুগে, ডেটা অ্যানালিটিক্স তথ্যের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্যগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামগ্রিক দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগে সংস্থা ডেটা বিশ্লেষণ করার জন্য ম্যানুয়াল এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করত। এতে সময়মতো মূল্যবান বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট তৈরি করা প্রায় অসম্ভব ছিল। প্রক্রিয়াটি মানবিক ত্রুটিপ্রবণ ছিল। ডিজিটালাইজেশন যাত্রার অংশ হিসেবে ডেটা অ্যানালিটিক্সের আবির্ভাবের সাথে সাথে আমরা এখন দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে বিপুল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছি। ডেটা অ্যানালিটিক্সের বাস্তবায়ন সংস্থাকে বেশ কয়েকটি মূল লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতা দেয়। প্রথমত, এটি ব্যাপক তথ্য থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের বিশ্লেষণ প্রদান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোকে উন্নত করে। দ্বিতীয়ত, এটি সংস্থাকে উন্নতির জন্য নতুন সুযোগ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো শনাক্ত করতে উৎসাহিত করে। তৃতীয়ত, রিপোর্টের অটোমেশন অপারেশনাল ওয়ার্কফ্লোকে বেগবান করে। সর্বোপরি, ডেটা অ্যানালিটিক্স সংস্থার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়ায়।

সায়েমা ইয়াসমিন, সহকারী কর্মকর্তা– আইসিটি

প্রতিদিনের মাইক্রোফাইন্যান্স কার্যক্রমকে অটোমেশন করা বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের প্রথম পদক্ষেপ। পাশাপাশি অ্যাকাউন্টিং, লজিস্টিক, লোন ম্যানেজমেন্ট, ডকুমেন্ট আর্কাইভিংসহ রেমিট্যান্স কার্যক্রম ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার পরিচালনার মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। এর ফলে দক্ষ কর্মী তৈরি, সুবিন্যস্ত যোগাযোগ, সহজে ডেটা অ্যাক্সেস, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, গ্রাহকের সন্তুষ্টি বৃদ্ধি, আর্থিক সেবা গতিশীল করার জন্য নতুন নতুন সেবা পরিচালনা, কাগজবিহীন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা ও অপারেশনাল দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাটেনডেন্স, পে-রোল ম্যানেজমেন্ট, ছুটি ব্যবস্থাপনা, সংস্থার আয়-ব্যয় প্রতিবেদন, স্টাফ বেনিফিট ম্যানেজমেন্টসহ বিভিন্ন এইচআর কার্যক্রমকে একক প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত করে কর্মীদের তথ্য পরিচালনা ও ব্যক্তিগত বিবরণ ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করেছে। যদিও ডিজিটালাইজেশন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর ও দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করে কিন্তু একই সাথে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের যাত্রায় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনও হতে হয়েছে। সে লক্ষ্যে কর্মীদের প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদান করছে।

মীর মাহবুব আলমগীর, সহকারী কর্মকর্তা– আইসিটি

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ হলো Office 365 ই-মেইল ব্যবহার শুরু করা। এর মাধ্যমে সব শাখা, এলাকা, আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং প্রধান কার্যালয়ে ই-মেইলে আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ করছে। পেপারলেস অফিসের লক্ষ্যে সংস্থায় সংযুক্ত হয় ই-ফাইলিং সফটওয়্যার। অতীত এবং বর্তমান সব কর্মীর তথ্য স্ক্যান এবং সংরক্ষণ করা হয় এই সফটওয়্যারে। কর্মীদের লিখিত ছুটির আবেদন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের মাধ্যমে। তাছাড়া স্যালারি সার্টিফিকেট, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট, স্যালারি অ্যাডভান্স, বাইসাইকেল/মোটরসাইকেল লোন, শাখা অফিসসমূহের ভাড়ার হিসাবসহ কর্মীর এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি সংরক্ষিত হচ্ছে এই সফটওয়্যারে। কর্মীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের কাজটি হচ্ছে বাৎসরিক কর্মী মূল্যায়ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে। যার মাধ্যমে কর্মীর সার্বিক মূল্যায়ন করে তার বিষয়ে মানবসম্পদ বিভাগ পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সব চিঠিপত্রের হিসাব রাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে ডকুমেন্ট ট্র্যাকার সফটওয়্যারও। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান সব ব্যবহার্য দ্রব্য এবং সম্পদের হিসাব রাখার জন্য ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার, বিভিন্ন ধরনের লোন ব্যবস্থাপনার জন্য লোন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার ব্যবহার করছে।

তানজিনুল ইসলাম সৌরভ, ঊর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক– আইসিটি, মধুপুর অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশ ক্ষুদ্র অর্থায়নে ডিজিটাল সেবায় নিয়ে এসেছে আমূল পরিবর্তন। শুরুতে ডেস্কটপভিত্তিক সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হলেও পরবর্তীতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে তালমিলিয়ে অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যার যুক্ত হয়, যেখানে সদস্যদের আর্থিক লেনদেনের তথ্য নিরাপদে ডাটাবেজ সিস্টেমে জমা হচ্ছে। অনলাইনভিত্তিক সফটওয়্যারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় রিয়েলটাইম রিপোর্ট এবং ডাটা এনালাইসিস করার ফলে হিসাবের স্বচ্ছতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ফলোআপ এবং মনিটরিং সম্ভব হচ্ছে, যা সংস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বুরো বাংলাদেশের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে ট্যাবের মাধ্যমে রিয়েলটাইমে কালেকশন করছে। এর ফলে আরও বেশি সদস্যদের আর্থিক সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও রেমিট্যান্স গ্রাহকদের জন্য দ্রুত সেবা এবং নিরাপদ ও বৈধ লেনদেনের জন্য রয়েছে রেমিট্যান্স সফটওয়্যার। প্রতিটি শাখায় ইন্টারনেট সংযোগের দরুন ই-মেইল যোগাযোগ, কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে ভার্চুয়াল ট্রেনিং, ভার্চুয়াল মতবিনিময় সভা ও অনলাইনের মাধ্যমে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সাধন কুমার চৌহান, ব্যবস্থাপক– আইসিটি, টাঙ্গাইল অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশ প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়ে সবসময় তৎপর, এ লক্ষ্যে ক্লাউড সিকিউরিটি সফটওয়্যার ব্যবহার করার মাধ্যমে দূর থেকেই সংস্থার কম্পিউটারগুলোর নিরাপত্তা তদারকি করা যায়। সংস্থার বড় অংশের কর্মীদের নিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে ভার্চুয়ালি বিশেষ সভা করা সম্ভব হচ্ছে। সংস্থার বড় অংশের কর্মীদের অনলাইনে কনফার্মেশন/পদোন্নতি পরীক্ষা নেওয়া ও তার ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে যা তথ্যপ্রযুক্তির বিশাল অর্জন। প্রতিটি কাজই ব্যয়বহুল ছিল কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়া সম্ভব হয়েছে। সংস্থার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হলো ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস, যার মাধ্যমে সংস্থা উপকৃত হচ্ছে ও সাথে সাথে জনসাধারণের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সময় কম ব্যয় হচ্ছে। আবার লিকুইড ক্যাশ সাথে নিয়ে কিস্তি দিতে হচ্ছে না ফলে টাকা হারানো বা ছিনতাইয়ের ভয় কমছে। ডিএফএসের মাধ্যমে সংস্থার সব সদস্য যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় লেনদেন সম্পূর্ণ করতে পারেন। গ্রিন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পেপারলেস পদ্ধতি অনুসরণ করা যা জলবায়ু পরিবর্তনে ইতিবাচক সাড়া দেবে। অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও উদ্যোক্তা গ্রাহকদের জন্য সংস্থা কনজ্যুমার লোন প্রদান করে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা তাদের পছন্দমতো স্মার্ট মোবাইল ফোন অথবা ট্যাব গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল ট্রানজেকশন করতে পারছে।

সাইবার নিরাপত্তায় আমাদের করণীয়

জাহাঙ্গীর আলম

তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত ক্রমবিকাশের এ যাত্রায় বর্তমানে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ছাড়া যেমন নিজেকে ভাবা যায় না তেমনি কম্পিউটার ডিভাইস ছাড়া অফিস চিন্তা করা অসম্ভব। আমাদের প্রাত্যহিক কাজ বা অবসর সময়ের অনেকাংশ বিচরণ এখন ভার্চুয়াল জগতে। সাইবার অপরাধীরা ওঁৎ পেতে বসে আছে সুযোগের অপেক্ষায়, তাই ডিজিটাল মাধ্যমে বর্তমানে মাথা ব্যথার কারণ হলো সাইবার নিরাপত্তা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে যাচ্ছে, এছাড়া চুরি হয়ে যাচ্ছে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য। তাই ইন্টারনেট জগতে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে জানতে হবে সাইবার নিরাপত্তার কলাকৌশল। আসুন জেনে নেই কীভাবে নিজেকে ও প্রতিষ্ঠানকে সাইবার জগতে সুরক্ষিত রাখতে পারি।

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড: অননুমেয় ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড হলো ডিজিটাল মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকার প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। কমপক্ষে ৮ অক্ষরের দীর্ঘ ও জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। বড় এবং ছোট হাতের অক্ষর, সংখ্যা, চিহ্ন ইত্যাদির সমন্বয়ে পাসওয়ার্ড তৈরি করুন। বছরে অন্তত দুবার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন তবে তিন মাস অন্তর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা উত্তম। বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করলে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকবে সুরক্ষিত। এছাড়া কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্ট থেকে লগআউট করে ফেলুন। ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, ই-মেইল, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও অন্যান্য সব অ্যাকাউন্টে টু-স্টেপস ভেরিফিকেশন চালু করুন যাতে নতুন করে অ্যাকাউন্ট লগইন করতে গেলে মোবাইল বা ই-মেইলে ভেরিফাই করতে হয়, এতে হ্যাকার আপনার পাসওয়ার্ড জেনে গেলেও আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করতে পারবে না।

ফিশিং লিংক সাবধান: আপনি লটারিতে টাকা বা গাড়ি জিতেছেন অথবা কোনো লোভনীয় অফার পেয়েছেন, তা হলে সাবধান ভুলেও কারও দেওয়া লিংকে ক্লিক করবেন না। কোনো অপরিচিত নাম্বার বা ই-মেইল হতে আপনার মোবাইলে

> অপরিচিত কেউ যদি আপনার অনলাইনের কোনো তথ্য চায় যেমন-ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এনআইডি নাম্বার, জন্ম তারিখ, নগদ নাম্বার, বিকাশ নাম্বার ইত্যাদি তা হলে এড়িয়ে চলুন। অপরিচিত কাউকে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

কোনো লিংক কিংবা ছবি এলে তা কোনোক্রমেই ওপেন করতে যাবেন না। লিংকে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার ডিভাইসে ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে আপনার ডিভাইস হ্যাক হয়ে যেতে পারে। এছাড়া লিংকের মাধ্যমে হাতিয়ে নিতে পারে আপনার বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

এছাড়াও অপরিচিত কেউ যদি আপনার অনলাইনের কোনো তথ্য চায় যেমন-ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, এনআইডি নাম্বার, জন্ম তারিখ, নগদ নাম্বার, বিকাশ নাম্বার ইত্যাদি তা হলে এড়িয়ে চলুন। অপরিচিত কাউকে ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ব্যাকআপ নিশ্চিত করুন: যেকোনো মুহূর্তে আপনার ল্যাপটপ বা মোবাইল ফোন চুরি কিংবা হারিয়ে যেতে পারে তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত তথ্য ডিভাইসের বাইরে ব্যাকআপ সংরক্ষণ করুন। এছাড়া ম্যালওয়্যার বা ভাইরাসর আক্রমণে আপনার ডিভাইসের তথ্যগুলো এনক্রিপ্টেড হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তথ্যের সুরক্ষার জন্য ডিভাইসের বাইরে ক্লাউডে বা হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ করুন তা হলে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতেও আপনার তথ্য থাকবে নিরাপদ।

ডিভাইসের সিকিউরিটি প্যাচ আপ টু ডেট রাখুন: আমাদের কম্পিউটার ও মোবাইলে নিয়মিত আপডেট আসে, অনেক সময় আমরা তা এড়িয়ে যাই, এতে আমাদের ডিভাইসগুলো অরক্ষিত হয়ে পরে। নতুন নতুন সাইবার অ্যাটাক প্রটেক্ট করার জন্য এই সিকিউরিটি প্যাচ আপডেট প্রদান করা হয়, আমাদের ডিভাইসের সিকিউরিটি প্যাচ আপডেট রাখলে সিস্টেমকে অনেকটাই সুরক্ষিত রাখা যায়।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ভাইরাস, স্পাইওয়ার, ম্যালওয়্যার ও হ্যাকার হতে কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখতে অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার, ফায়ারওয়াল ইত্যাদি ব্যবহার করুন।

যেকোনো সফটওয়্যার ও অ্যাপ ব্যবহারে সতর্কতা: অনলাইন থেকে বা অপরিচিত উৎস থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ও অ্যাপ ব্যবহার করে থাকি। লক্ষ্য করে দেখবেন যে এসব সফটওয়্যার ইনস্টল করার সময় তারা আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি, কন্টাক্টলিস্ট ইত্যাদি দেখার অনুমতি চায়। অর্থাৎ ইনস্টল করা মাত্রই আপনি আপনার ব্যক্তিগত তথ্যে তাদের এক্সেস দিয়ে দিচ্ছেন। অতএব সাবধান থাকুন অযথা সফটওয়্যার ও অ্যাপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

এছাড়া আপনার সাথে কোনো তারকার চেহারার

মিল আছে বা বৃদ্ধ বয়সে আপনাকে কেমন দেখাবে কিংবা ভবিষ্যতে আপনি কি হবেন এ ধরনের লিংকে ঢুকে হয়তো অগোচরে আপনার অ্যাকাউন্টের এক্সেস তুলে দিচ্ছেন অন্যের হাতে। তাই এ জাতীয় লিংকে ক্লিক করা হতে বিরত থাকুন। যদি কোনো অপরিচিত সফটওয়্যার বা অ্যাপসে প্রবেশের সময় আপনার ব্যক্তিগত তথ্য বা অ্যাকাউন্ট এক্সেস চায়; তবে সেখানে না প্রবেশ করাই উত্তম।

আপনার একান্ত ব্যক্তিগত বা কোনো অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও ধারণ করবেন না এবং এসব ছবি অনলাইনে কারও সাথে শেয়ার করবেন না। নিজে ডিলিট করে দেবেন বা কেউ দেখেই ডিলিট করে দেবে তা বিশ্বাস করা বোকামি। কারণ এসব ছবি ও ভিডিও ডিলিট করলেও মেমোরি কার্ড থেকে রিকভারি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যায় এভাবে আপনাকে বা আপনার প্রিয়জনকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। আপনার ফোন হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে এসব ছবি বা ভিডিও ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে অথবা আপনার ফোন সার্ভিস সেন্টারে দিয়েছেন সেখান থেকেও আপনার তথ্য চুরি হয়ে যেতে পারে। তাই এসব সংবেদনশীল তথ্যের ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা ও সতর্কতা অতীব জরুরি।

এখন অফিসের প্রায় সব কাজকর্ম বাস্তবায়ন, ই-মেইলিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানো, ইন্টারনেট মাধ্যমে কেনাকাটা, অনলাইন ব্যাংকিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবার সাথে যোগাযোগ স্থাপনসহ দৈনন্দিন প্রায় সব কাজের এক অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবস্থাপনা। তাই অনলাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সবাইকে অনলাইন শিষ্টাচার মেনে চলা উচিত। অনলাইনে গেম খেলা, বিভিন্ন ধরনের অপরিচিত সন্দেহজনক সাইট ভিজিট করা, জুয়া খেলা, পর্ণ দেখা, বাজি ধরাসহ অনলাইনে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজে যুক্ত না থাকলে আমরা সাইবার জগতে নিজেদের অনেকটাই সুরক্ষিত রাখতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠী ও শিশুরা অনলাইনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তাই নিজেদের পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীদের মাঝে সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা তৈরি করতে হবে। এভাবেই আমরা নিজেদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ সাইবারস্পেস নিশ্চিত করতে পারব। ■

● লেখক : কর্মকর্তা, আইসিটি
বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশের আইসিটি টিম

ডিএফএস
নতুন এক আলোর সন্ধান

বুরো বাংলাদেশের শশীভূষণ শাখার সদস্য মোসাম্মৎ রিনা। সংসারের সার্বিক কাজ সামলে ১০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি দেওয়া তার কাছে অনেক কষ্টকর ও খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিষয়ে জানতে পেরে তিনি যেন বড় একটি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হন। বিগত ৩-৪ বছর ধরে মোসাম্মৎ রিনা বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় স্বাচ্ছন্দ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করছেন।

মোসাম্মৎ রিনা
স্বামী: মো. আবুল খায়ের
চরফ্যাশন, ভোলা
শাখা শশীভূষণ
সমিতি নং-২০০৩
সদস্য নং- ০০২৪৩

ভোলা জেলার অন্তর্গত চরফ্যাশন উপজেলার শশীভূষণ থানাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম দক্ষিণ চর মঙ্গল। এই গ্রামে স্বামীসহ ৩ সন্তান নিয়ে বসবাস করেন বুরো বাংলাদেশের শশীভূষণ শাখার সদস্য মোসাম্মৎ রিনা। মোসাম্মৎ রিনা একজন গৃহিণী হলেও তার পল্লী চিকিৎসক স্বামীর বিভিন্ন কাজে সবসময় সহায়তা করেন। পাশাপাশি ২ ছেলে ও ১ মেয়ের সংসারে শত বাধা পেরিয়েও সন্তানদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে মোসাম্মৎ রিনা যথেষ্ট সচেতন। তার বড় ছেলে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক পড়ছেন। স্বামী মো. আবুল খায়ের পল্লী চিকিৎসার পাশাপাশি এলাকায় ওষুধের দোকান পরিচালনা করেন। সংসারের এই সার্বিক কাজ সামলাতেই মোসাম্মৎ রিনা হিমশিম খেয়ে যান, তারপর আবার ১০ কিলোমিটার দূরে গিয়ে বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি দেওয়া তার কাছে অনেক কষ্টকর ও খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু স্বামী বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় উনিও সময়মতো কিস্তি দিতে যেতে পারেন না। বুরো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট কর্মী কিস্তি নিতে এলেও মাঝেমধ্যে তিনি বাসার বাইরে থাকেন বা অনেক সময় জমানো টাকাও খরচ হয়ে যায়। ফলে পুনরায় কিস্তির টাকা জোগাড় করা বা পাঠানোর ব্যবস্থা করা তার জন্য ভীষণ কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে মোসাম্মৎ রিনা বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি পরিশোধের ঝামেলার বিষয়ে বড্ড হতাশ হয়ে পড়েন।

পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিষয়ে জানতে পেরে তিনি যেন বড় একটি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হন। বর্তমানে বিগত ৩-৪ বছর ধরে মোসাম্মৎ রিনা বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় স্বাচ্ছন্দ্যে ডিজিটাল মাধ্যমে প্রদান করছেন। মোসাম্মৎ রিনা বুরো বাংলাদেশের ডিএফএস কার্যক্রমে অত্যন্ত খুশি। যদিও তিনি নিজে লেনদেন করতে পারেন না, কিন্তু তার স্বামী এবং সন্তান খুব সহজেই লেনদেন করতে পারেন। গ্রামের বিভিন্ন লোক এলাকার বাইরে কাজের ক্ষেত্রে থাকেন। তাদের পরিবারের নিয়মিত চিকিৎসা ও পাওনা টাকা মোসাম্মৎ রিনার স্বামী মো. আবুল খায়েরের বিকাশ অ্যাকাউন্টে পাঠায়। মো. আবুল খায়ের উক্ত টাকা ক্যাশ

আউট না করে বিকাশেই জমিয়ে রাখেন। বর্তমানে মোসাম্মৎ রিনা বুরো বাংলাদেশের ৩ লাখ টাকার ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমাসহ প্রতি মাসে ১৭৫০০ টাকা বা তার বেশি টাকা প্রদান করেন। বিকাশে জমানো টাকা থেকে তার স্বামী অনায়াসে বুরো বাংলাদেশের ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমা করেন। অন্যদিকে তাদের প্রতি মাসে কিস্তির টাকার জন্য তেমন ভাবতেও হয় না। মো. আবুল খায়ের তার বিকাশ অ্যাকাউন্টে যখন যা পারেন তাই সঞ্চয় করেন। তারপর একসাথে বুরো বাংলাদেশের কিস্তির টাকা ডিজিটালি প্রদান করেন। এতে করে তিনি যেমন স্বস্তি পাচ্ছেন তেমনি খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি থেকেও মুক্ত হচ্ছেন। তার ভায়ায়, 'ডিএফএস নম্বর আর আমাদের ঋণের হিসাব নম্বর দিয়ে টাকার পরিমাণ দিলেই সব টাকা একসাথে বুরো বাংলাদেশে আমার সব হিসাবে চলে যায়। এমনকি ওই নম্বরগুলো বারবার দেওয়াও লাগে না। সেভ করে রাখা যায়। তাই আমাদের টাকা এখন আমি নিজেই দিই। জমা হলো কি না তা আমি নিজেই দেখতে পারি। ফলে টাকা জমা হওয়ার বিষয়ে আমার আর কোনো চিন্তাই থাকে না। আমার সঞ্চয় কত জমা হলো বা ঋণের আর কত টাকা বাকি থাকল এসব জানার জন্য আমি কারও কাছে ফোনও দিই না। আমারটা আমি নিজে নিজেই দেখে নিই। এভাবেই কিস্তিও শোধ হচ্ছে আবার এদিকে আমার কষ্টও হচ্ছে না। আগে আমি বিকাশ থেকে ক্যাশ আউট করে কিস্তি ও সঞ্চয় দিতাম। এতে করে আমার অনেক টাকা বাড়তি খরচ হতো। কিন্তু এখন ১৭৫০০ টাকায় মাত্র ১৫০ টাকা খরচ হওয়াতে আমার অনেকটা সাশ্রয়ও হচ্ছে।'
মোসাম্মৎ রিনা ও তার স্বামী মো. আবুল খায়ের বুরো বাংলাদেশের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের মতে, যদি বুরো বাংলাদেশে এ ধরনের সুবিধা না থাকত তা হলে হয়তো বুরো বাংলাদেশের সাথে আর থাকাই হতো না। ফলে তাদের বর্তমান এই সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হতো। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ করছেন আবারও ঋণ নিচ্ছেন। কিস্তি দিতে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় আগে ঋণ নেওয়াটা ঝামেলা মনে হলেও এখন তিনি ঋণ নেওয়ার বিষয়টি ঝামেলা মনে করেন না। বুরো বাংলাদেশে ডিএফএস চালুর কারণে তিনি ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি সঞ্চয় জমা করতে পারছেন যা আগে কখনোই করতে পারেননি। তিনি সবসময় সবার সাথে বুরো বাংলাদেশের এই ডিজিটাল সেবার বিষয়ে আলোচনা ও প্রশংসা করেন।
এভাবেই সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হাজারো মোসাম্মৎ রিনা ও তার স্বামীর মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে এক নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। ■

মো. শাহ্ আলম

● ব্যবস্থাপক-ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস
বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়

রফিকুল ইসলাম

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ভোলা

বুরো বাংলাদেশ ভোলা অঞ্চলের কর্মএলাকায় প্রথমে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করা হয় এবং এর সুবিধা সম্পর্কে গ্রাহকদের বোঝানো হয়। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে লেনদেনের নিশ্চয়তা সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে কীভাবে লেনদেন করতে হয় তা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি পাশবইতে ডিজিটাল হিসাব নম্বর দেওয়া হয় এবং গ্রাহকদের ভালোভাবে হিসাব নম্বর সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। আমাদের কর্মএলাকার অধিকাংশ লোকই কর্মসংস্থানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় এবং অনেকেই লঞ্চ ও নৌকায় কাজ করে থাকে। যার ফলে উপার্জনের অধিকাংশ টাকাই বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে লেনদেন করে। যেসব গ্রাহক বা যার উপার্জন দ্বারা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা হয় তারা সরাসরি নিজ কর্মস্থল থেকে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেন করে। আবার অনেক প্রবাসী পরিবার বিকাশের মাধ্যমে রেমিট্যান্স প্রদান করে, যার ফলে ঋণের কিস্তি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে পরিশোধ করা হয়। দুর্গম এলাকায় ব্যাংকিং সুবিধা তেমন না থাকায় বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে লেনদেনের প্রতি গ্রাহকের আগ্রহ বেশি। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের ফলে গ্রাহকের বাড়িতে একাধিকবার যেতে হয় না এতে সময় এবং শ্রম দুটোই সাশ্রয় হয়। সদস্যরা কম খরচে অল্প সময়ের মধ্যে ঘরে বসে লেনদেন করতে পারে, যে কারণে যাতায়াত খরচ হয় না, ঝুঁকিতে পড়তে হয় না। সদস্যরা নিজেই তাদের লেনদেন করে থাকে এবং নিজেদের ব্যালেন্স যাচাই করতে পারে। ফলে সদস্যদের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে এবং এর প্রভাবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হচ্ছে।
সর্বোপরি ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সুবিধাগুলো দুর্গম এলাকায় প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত গ্রাহক সেবাদানের সক্ষমতাকে বহুগুণে প্রসারিত করেছে।

শাহীনূর ইসলাম খান
সহকারী পরিচালক, কর্মসূচি

বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন চালুর পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমাদের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ২৬ লাখ। তৃণমূল পর্যায়ে সেবাদানকারী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে দ্রুত সেবা প্রদান বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বর্তমানে আমাদের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সেবার মান দ্রুত ও উন্নত হয়েছে। একসময় এক কার্যালয়ের জরুরি চিঠি আরেক কার্যালয় বা অন্যত্র প্রেরণ করতে একজন কর্মীকে মোটরবাইক দিয়ে পাঠাতে হতো, এখন সেই চিঠি বা নির্দেশনাই একটা ক্লিকে পৌঁছে যায় প্রাপকের কাছে। এটি সম্ভব হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে। এই প্রযুক্তি যেমন মানুষের জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমকে সহজ করে দিয়েছে, তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমেও নিয়ে এসেছে স্বচ্ছতা এবং দ্রুততা। সেবা মানের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটেছে। এখন আর কোনো কর্মী সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তার ফাইল খুঁজে বের করতে হয় না, পাতা ওল্টাতে হয় না।

আমাদের এই ডিজিটালাইজেশন করোনাকালীন ব্যাপক কাজে লেগেছে। সংস্থার কর্মীরা বেতন-ভাতা ঘরে বসেই পেয়েছেন। অন্যান্য লেনদেনও এই ব্যবস্থায় দ্রুত সম্ভব হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির টাকাও এ পদ্ধতিতে দ্রুত তাদের হিসাবে জমা হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশ এভাবে 'পেপারলেস' ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এখন কর্মীদের ছুটির আবেদন অনলাইনে আসে এবং তা অনুমোদন হলে অনলাইনে জানিয়ে দেওয়া হয়। স্যালারি সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও দ্রুততার সাথে সঠিক তথ্য পান কর্মীরা।

খ. মুখলেছুর রহমান
সহকারী পরিচালক, মনিটরিং অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন

বর্তমান প্রযুক্তিগত বিশ্ব ব্যবস্থায় বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে বুরো বাংলাদেশের সব কার্যক্রমে ব্যাপক গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বুরো বাংলাদেশ দেশব্যাপী অন্যতম একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাও সাড়ে দশ হাজারের ওপরে। স্বাভাবিকভাবে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম পরিচালনা বেশ কঠিনই ছিল। সে ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি এই কর্মধারাকে সহজ করে দিয়েছে।

এই পদ্ধতিতে আমাদের গ্রাহকরা বাংলাদেশের যেকোনো স্থান থেকে লেনদেন করতে পারছেন এবং ক্রমেই আমরা ক্যাশলেস লেনদেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। পাশাপাশি অফিস কার্যক্রমেও আমরা পেপারলেস পদ্ধতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। একসময় আমাদের সদস্য কিংবা কর্মী সবার ক্ষেত্রেই টাকা বহন করা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এখন ঋণের কিস্তি আদায়ের জন্য আর বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, যেকোনো স্থান থেকে যে কেউ মোবাইল অ্যাপসে পরিশোধ করতে পারছে। অর্থাৎ সহজ হয়ে গেছে ঋণ প্রদান ও কিস্তি আদায়ের কার্যক্রম। এছাড়া অনেক সময় কর্মীরা টাকা উত্তোলন শেষে অফিসে আসার মুহূর্তে ছিনতাইয়ের শিকার হতো, নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক থাকত। কিন্তু এখন বেশ নিরাপদে মোবাইল ফাংশনে গিয়ে লেনদেন সম্ভব হচ্ছে।

আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা যেমন প্রধান কার্যালয়ে বসেই শাখার সব তথ্য দেখা যায়, ঋণ কিস্তির ওভার ভিউ দেখা যায়। পেপার ওয়ার্ক কমে গেছে, হাতে লিখতে হয় না। গ্রাহকরাও তাদের সফটওয়্যার অপশনে গিয়ে ক্যাশলেস কিস্তির পরিমাণ, কবে কিস্তি দিতে হবে সব দেখতে পাচ্ছে। ডিজিটালাইজড হওয়ায় 'সিআইবি' কার্যক্রমেও এর প্রভাব পড়ছে। বর্তমানে ২৭টি শাখায় এর পাইলটিং হচ্ছে। এর ফলে এক শাখার অ্যাকাউন্টের হিসাব থেকে অন্য শাখায় টাকা উত্তোলন করা যাবে। আগে মনিটরিং করতে শাখায় যেতে হতো, এখন রুমে বসেই করা যায় এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া যায়। পাশাপাশি এখন আর হাতে রিপোর্ট লিখতে হয় না এবং রিপোর্ট হয় নির্ভুল। কোথাও ত্রুটি থাকলে তা সহজেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন আমাদের কাজকে গতিশীল করেছে।

আশরাফুল আলম খান

সহকারী পরিচালক, এইচআরএম

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের এই অগ্রযাত্রা দেশের অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আমাদের শাখার সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এবং কর্মরত লোকের সংখ্যা সাড়ে দশ হাজারের ওপরে। এ ধরনের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে ম্যানুয়ালি কর্মযজ্ঞ পরিচালনা বিশেষ করে দায়িত্ব ও কর্মী ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই কঠিন বিষয়। এতে কর্মীদের বেতন-ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, বদলি, প্রমোশনসহ চাকরিকালীন ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করা ইত্যাদি সবকিছুতেই অনেক সময়ক্ষেপণ হতো। এছাড়া কর্মীদের বার্ষিক মূল্যায়ন (Annual Performance Aprizal-APA) করতে বেশ সময় লাগত। অনেক কাগজও লাগত। কিন্তু এখন ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় 'পেপারলেস' হয়েছে। এতে খরচ কমে গেছে এবং এ কাজে নিয়োজিতদের সময়ও বেঁচে গেছে। আগে প্রতিটি কর্মীর ফাইল বের করে বার্ষিক মূল্যায়ন করতে হতো কিন্তু এখন তা মুহূর্তেই জানা যায় তার পারফরমেন্স কি ছিল।

নিয়োগের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ কাজ ডিজিটাল হয়েছে। সে অনুযায়ী আবেদনকারীরা দ্রুত সাক্ষাৎকার কিংবা লিখিত পরীক্ষার ডাক পান মোবাইল ম্যাসেজেই তা জানানো হচ্ছে। আগে ছুটির জন্য আবেদনের পরপর ফাইল করে রাখতে হতো– এখন সব তথ্য পাওয়া যায় সিলভিয়াতেই। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, প্রত্যেকের পার্সোনাল ফাইল কম্পিউটার সফটওয়্যারে ই-ফাইলে সংরক্ষিত।

এতে ব্যয় কমে গেছে, কাজের জন্য সময় লাগে কম। কারও এনওসির প্রয়োজন, স্যালারি সার্টিফিকেট ও ছাড়পত্র প্রয়োজন সবই এখন কম্পিউটার অ্যাপস থেকে মুহূর্তেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

এরশাদ আলম

সহকারী পরিচালক, প্রশাসন

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন যাত্রা প্রতিষ্ঠানকে নতুন ধারার প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করেছে। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তির বিশ্ব। যতই দিন যাচ্ছে বিশ্ব ততই প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। যেকোনো প্রযুক্তিই মানুষের জীবনধারায় প্রভাব ফেলে। ঠিক সেভাবেই দাপ্তরিক কাজের ক্ষেত্রেও নিয়ে আসে অনেক সহজীকরণ। বুরো বাংলাদেশ দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। শাখার সংখ্যা প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ। এখানে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ কাজ করছে। ডিজিটালাইজেশনের আগে প্রতিদিনই শত শত চিঠি আসত, সে অনুযায়ী আমাদেরও উত্তর দিতে হতো। কিন্তু এখন আমাদের কার্যক্রম অনেকটাই পেপারলেস হয়েছে। এখন আর হার্ডকপিতে চিঠি আদান-প্রদান করতে হয় না। সফটওয়্যারের মাধ্যমে একটি বোতাম ক্লিক করেই সিদ্ধান্ত জানানো যাচ্ছে। আবার ই-মেইল চেক করেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা আবেদন আমরা ডাকের মাধ্যমে পেতাম। এখন আর হার্ডকপির প্রয়োজন হয় না। আমরাও দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাতে পারি।

ডিজিটালাইজেশনের ফলে আমাদের আর্থিক লেনদেনও এখন 'ক্যাশলেস'। এছাড়া আগে আমাদের ৩৪টি রেজিস্ট্রার ছিল– প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, অঞ্চল ও শাখায় এসব রেজিস্ট্রার ছাপিয়ে দিতে হতো, এখন আর তার প্রয়োজন হবে না। এতে অনেক সাশ্রয় হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের। চিঠিপত্র আসা এবং যাওয়ার জন্য যে লেজার মেইনটেইন করতে হতো তারও প্রয়োজন হচ্ছে না।

অর্থাৎ বুরো বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ব্যাপক গতিশীলতা অর্জন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

এবিএম আমিনুল করিম মজুমদার
সহকারী পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

বুরো বাংলাদেশ শুরু থেকেই চিন্তা-চেতনা ও কার্যক্রমের দিক থেকে প্রযুক্তিমুখী। সেক্ষেত্রে সংস্থার ডিজিটালাইজেশনের এই অগ্রযাত্রাকে আমি মনে করি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রযুক্তি সবসময়েই মানুষের জীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও সহজ করে দেয়। বর্তমানে বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমেও ব্যাপক গতির সঞ্চার ঘটেছে। প্রায় ১৫-১৬ বছর আগে ইমফাস সফটওয়্যারের মাধ্যমে কাজ শুরু করা হয়।

বুরো বাংলাদেশ প্রতি মুহূর্তেই সময়োপযোগী উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের সব ক্ষেত্রেই ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এসেছে। সকালে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হওয়া থেকে শুরু করে অফিস ত্যাগ করা পর্যন্ত এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। যুগান্তকারী এই উত্তরণের ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে। অতীতে ম্যানুয়াল পদ্ধতির কাজে অনিচ্ছাতেও বেশ সময় চলে যেত। কিন্তু এখন উইদিন এ সেকেন্ড বোতাম টিপতেই পাওয়া যাচ্ছে প্রয়োজনীয় বিষয়টি। এখন বুরো বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হচ্ছে।

ম্যানুয়ালি যেসব ডাটা করতে কাগজে-কলমে লিখতে হতো, চিঠির মাধ্যমে প্রেরণ করতে হতো এখন সেসব ডাটা পাচ্ছি ক্লিকের মাধ্যমে। উঠে আসছে সার্বিক চিত্র। ভুলভ্রান্তি কম হচ্ছে। দেখেই সিদ্ধান্ত দেওয়া যাচ্ছে। বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়ায় পরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশনা দেওয়া যাচ্ছে দ্রুত।

ইতিমধ্যে কর্মীরাও এভাবে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন আমাদের সব কর্মীকে প্রযুক্তি দক্ষ কর্মীতে পরিণত করেছে– এটি কিন্তু দেশের দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক একটি দিক। ভুল ধরার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না, টেবিলে বসেই দেখা যায়। আগে যেখানে ফিজিক্যালি যেতে হতো তার প্রয়োজন হয় না। আগে কেউ একজন কোনো ভুল তথ্য দিলে সেখানে সরেজমিন না যাওয়া পর্যন্ত, ফাইল না দেখা পর্যন্ত ধরা যেত না কিন্তু এখন এখান থেকেই অথেনটিকেট করা সম্ভব হয়। ডিজিটালাইজেশন আমাদের যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার সুযোগ করে দিয়েছে।

সাইদুর রহমান
সহকারী পরিচালক, কর্মসূচি

ডিজিটালাইজেশন বুরো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে সহজ ও গতিশীল করেছে। একই সাথে আমরা যারা এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি তাদের কার্যধারাকেও সহজ ও সুন্দর করেছে। ডিজিটালাইজেশন এমন একটি প্রক্রিয়া যা কাজকে দ্রুত করে, কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি করে এবং সেবার মানও হাজারগুণ বাড়িয়ে দেয়। অতীতে যখন ম্যানুয়াল পদ্ধতি ছিল তখন আমাদের সবকিছুই কাগজে-কলমে হতো, হিসাব রাখতে বড় বড় রেজিস্ট্রার লাগত, গ্রাহকদের কিস্তি আদায়ের জন্য কাগজের শিট নিয়ে যেতে হতো, তাদের পাশবইয়ে এন্ট্রি দিতে হতো। আবার তা সংগ্রহ করে অফিসে এসে হিসাবরক্ষকের কাছে জমা দিয়ে রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি করতে হতো। কিন্তু এখন এক মুহূর্তে শুধু ল্যাপটপের মাধ্যমে সব কাজ সম্পাদন করা যাচ্ছে। ঋণগ্রহীতারাও বিকাশ/নগদসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার কিস্তি ঘরে বসেই জমা দিতে পারছে। আবার তার টাকা জমা হওয়া মুহূর্তেই সে এসএমএস পাচ্ছে।

আমাদের কর্মীরা মোবাইল ফোনেই তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারছে। আমাদের কাছে আসার জন্য ঋণগ্রহীতাকে সময় দিতে হচ্ছে না, সে নিজের কাজগুলো শেষ করতে পারছে। আমাদের কর্মীদেরও বাড়তি সময় প্রয়োজন হচ্ছে না, সে এই সময়ে অন্যান্য কাজে মনোযোগ দিতে পারছে। টেকনোলজি আমাদের কাজকে সহজ করে দিয়েছে এবং বেশি এলাকায়, বেশি মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। এতে আমাদের কর্মীরা তাদের দক্ষতা দিয়ে অধিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে তত্ত্বাবধানের কাজটিও দক্ষতার সাথে সুন্দরভাবে করা যায়। কারণ, আমাদের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে সঠিক দায়িত্ব পালন করছে কি না তা আমরা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমেই দেখতে পারি। কখন কত আদায় হলো, বিতরণ হলো– সব মুহূর্তেই দেখা যায় এবং কাজে স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে করি ডিজিটালাইজেশন আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং একই সাথে দেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এস এম এ রকিব
সমন্বয়কারী, বিশেষ কর্মসূচি

প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্ব ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে যার ছোঁয়া বাংলাদেশেও লেগেছে। বাংলাদেশও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে। প্রযুক্তির এই অভিযাত্রায় দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশও তার কার্যক্রমকে গতিশীল ও সহজ করার জন্য ডিজিটালাইজেশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া আমাদের কার্যক্রমকে যেমন গতি এনে দিয়েছে, তেমনই প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করেছে।

আমাদের বিশাল এ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে অনেক জটিলতা হতো, দীর্ঘসূত্রতা হতো– এটা কিন্তু এখন ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় সেই সমস্যাগুলো নেই। প্রধান কার্যালয়ে বসে যেমন মনিটরিং করা যাচ্ছে আবার বাটন টিপে এক মুহূর্তে দেশের সব শাখায় নির্দেশনা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে।

রেমিট্যান্সের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা অতি দ্রুত করতে হয় তা এখন ডিজিটালাইজেশনের ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই গ্রাহকের নিকট রেমিট্যান্স দ্রুত প্রেরণ করা যাচ্ছে।

বিশেষ করে রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সাধিত হয়েছে। আমরা স্ক্যান করে নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারছি। লিঙ্ক দিয়ে তথ্য জানতে পারছি। আগে রিকনসিলেশন করতে অনেক সময় ব্যয় হতো, এখন তা দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন এই সেক্টরকে বিশেষ করে লাখ লাখ মানুষকে প্রযুক্তি সংযুক্ত করেছে।

ডিজিটালাইজেশনের এই প্রক্রিয়ায় আমরা যখন অফিসে প্রবেশ করছি তাও করছি প্রযুক্তি দিয়ে। এর ফলে অফিসে উপস্থিতির ক্ষেত্রে একটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়েছে।

জাফর আহমেদ জুয়েল
সহকারী সমন্বয়কারী, লজিস্টিক অ্যান্ড প্রকিউরমেন্ট

বুরো বাংলাদেশ আজ যে ডিজিটালাইজেশনের সড়কে উঠে এসেছে তা আমাদের সবার জন্যই আনন্দের। প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু অফিসিয়াল কার্যক্রমকেই সহজ করে না, ব্যক্তি জীবনকেও সহজ করে তোলে। অতীতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজের বিষয়টি ছিল জটিল। এখন আর তা নেই। ডিজিটালাইজেশনের ফলে কাজে অন্য ধরনের আনন্দ এসেছে। কারণ, কাজটা লাইভ হয়েছে, ফিডব্যাক পাওয়া যায় সাথে সাথে। আগে কাজের আউটপুট সীমিত ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল। এখন আউটপুট অনেক বেশি। এ পদ্ধতিতে কর্মকর্তা/কর্মীদের মুভমেন্ট কমে এসেছে, খরচও কমে এসেছে, আবার যোগাযোগ দ্রুত ও বেশি হচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশনের ফলে কাজের অংশগ্রহণ অনেক বেড়েছে। শর্ট নোটিসেই মিটিং করা যায় ভার্চুয়াল ফোরামে। এতে ব্যয়ও অনেক কম হয়। দ্রুত ড্রাফটিং করে পাঠানো যায় মোবাইল বা অ্যাপসে। অর্থাৎ চাহিদাপত্র ও অনুমতিপত্র এখন পেপারলেস হয়ে গেছে। আগে ড্রাফটিং করতে হতো। কাগজে তা প্রিন্ট করে পাঠাতে হতো। এখন সফট কপিতেই সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। ডকুমেন্ট হারানোর বা সরিয়ে নেওয়ার ভয় নেই। আগে ভুলভ্রান্তির আশঙ্কা থাকত– এখন কাজ হচ্ছে নির্ভুল। আগে কোনো অর্ডার দেওয়ার আগে মালপত্র দেখে আসতে হতো, দরদাম করতে হতো সেখানে গিয়ে। কোয়ালিটি দেখতে অনেকবার যেতে হতো যানজটের মধ্যে। মিটিং করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। এখন এখানে বসেই দরদাম করা যায়। মালপত্র সম্পর্কে, কোয়ালিটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া যায়। অনলাইনে সার্চ দিলেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে জানা যায়। বাজারদর জানা যায়। এরপর টেলিফোনে কথা বলা যায়।

শাখা ও অন্যান্য কার্যালয় থেকেও ই-মেইলেই চাহিদাপত্র আসছে। আশার কথা, বুরোর নিজস্ব প্রকিউরমেন্ট সফটওয়্যারের কাজ চলছে। এটি হলে আরও দ্রুত ও জটিলতামুক্তভাবে কাজ করা সম্ভব হবে।

শফিকুল ইসলাম
সহকারী সমন্বয়কারী, অর্থ ও হিসাব

দেশের অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসাবে বুরো বাংলাদেশ তার কার্যক্রমকে গতিশীল ও সহজ করার জন্য ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এটি নিঃসন্দেহে ভালো উদ্যোগ। ডিজিটালাইজেশনের ফলে অনেক সদস্য ঘরে বসেই ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয় সেবা গ্রহণ করছে এবং বিদেশ থেকে আসা সব ধরনের রেমিট্যান্স বুরো বাংলাদেশের সব শাখা থেকে সহজে এবং দ্রুত সময়ে গ্রহণ করতে পাচ্ছে। সংস্থার কর্মীরা সদস্যের কাছ থেকে সব ধরনের কালেকশন কেন্দ্রে বসেই সফটওয়্যারে এন্ট্রি করতে পারছে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে লেনদেন করার ফলে সংস্থার কর্মীরা নগদ অর্থ বহন করার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সংস্থার সব শাখার রিপোর্ট প্রদান ও হিসাব কার্যক্রম সহজে এবং দ্রুত সময়ে করা যাচ্ছে। সদস্যের চাহিদা অনুযায়ী হিসাব এক শাখা থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যায়। সংস্থার সব কর্মীদের নিয়ে একসাথে অনলাইন জুম মিটিং করা হচ্ছে ফলে যাতায়াতের অনেক সময় সাশ্রয় করা ও আর্থিক ব্যয় কমানো সম্ভব হয়েছে। এককথায় আমাদের সব ধরনের যোগাযোগ সহজ এবং দ্রুত সময়ে করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব। ডিজিটালাইজেশন আমাদের কার্যক্রমকে যেমন গতিশীল করেছে তেমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করেছে। এটি আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু সংস্থার সবার প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে অর্থ ও হিসাব বিভাগের কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। যেমন:

হিসাব একত্রীকরণ করা সহজ হয়েছে।

কর্মীদের বেতন-ভাতা করা এবং বেতন-ভাতা সনদের আবেদন ও সনদ প্রদান করা।

প্রধান কার্যালয়ের সাথে অন্যান্য কার্যালয়ের মিলকরণ করা।

তহবিলের চাহিদা আরএলএফ সফটওয়্যার প্রদান করা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে তহবিল প্রেরণ করা।

কাগজের ব্যবহার কমানো এবং

বেতন ও ভাতার উৎসে করের সামারি প্রস্তুত করা এবং Withholding Return সিডিউলের তথ্য নেওয়া সহজ হয়েছে।

এক নজরে বুরো বাংলাদেশ

কর্মরত জেলা
৬৪

ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা
১৯ লক্ষ ৭৩ হাজার

সদস্য সংখ্যা
২৬ লক্ষ ৮২ হাজার

কর্মী সংখ্যা
১০,৬৩৩ জন

দূর পাহাড়ে স্মার্ট লেনদেন শেখাচ্ছে বুরো

রাঙামাটির কুতুবছড়ি বাজারে একটি মুদি দোকান চালান রাসেল চাকমা। ব্যবসায়িক লেনদেন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা থেকে শুরু করে পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবের সাথেও প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন ডিজিটালি করে থাকেন তিনি। নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি না নিয়ে হাতে থাকা স্মার্টফোনকে তিনি আর্থিক লেনদেনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

হাতের স্মার্টফোনটি দেখিয়ে বললেন, আগে বাটন মোবাইল ব্যবহার করতাম। খুব বেশি টাকা হাতে কখনোই থাকে না, যেটি দিয়ে ভালো একটি মোবাইল কিনবো। এ মোবাইলটা কিস্তিতে নিয়েছি বুরো থেকে, কনজ্যুমার ঋণ হিসেবে। দোকান খোলা রেখে বের হওয়ার তো উপায় নেই, বন্ধ রেখে কোথাও গেলেও আমারই ক্ষতি, তাই মোবাইলেই সব লেনদেন করি।'

ডিজিটাল লেনদেনে রাসেল চাকমার অভ্যস্ত হয়ে ওঠা কীভাবে? রাসেল জানালেন ডিজিটাল লেনদেনে তার হাতেখড়ির গল্প।

রাসেলের বাড়ি বাদলছড়ি গ্রামে। বাবা-মা, স্ত্রী ও ছোট এক ছেলে সন্তান নিয়ে তার পরিবার। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী তিনিই। পড়াশোনা শেষে কর্মজীবন শুরু করেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে। চাকরিতে তেমন সুবিধে করতে না পারায় চাকরিটি ছেড়ে দেন।

নিজের জমানো টাকায়, কম পুঁজি নিয়ে ২০১৮ সালে শুরু করেন মুদির দোকান। ব্যবসা শুরুর কয়েক দিনের মধ্যে দোকান পরিচালনায় হিমশিম খেতে হয় রাসেলকে। প্রয়োজনীয় অনেক নিত্যপণ্য দোকানে না থাকায় অন্য দোকানে চলে যেতেন গ্রাহকরা। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, দোকানের আয় দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ এবং ছেলের স্কুলের খরচ যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সাধারণত, পাহাড়ের বেশিরভাগ মানুষই আর্থিক টানাপড়েনে পরিচিত ও নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকেই অর্থ সহায়তা নিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকেন। রাসেলও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ব্যবসার দুরাবস্থার কারণে কেউ টাকা ধার দিতে রাজি না হলে তিনি যোগাযোগ করেন বুরো বাংলাদেশের রাঙামাটি শাখায়।

প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর বুরো বাংলাদেশের রাঙামাটি শাখা অফিস থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা পান রাসেল। এই টাকার পুরোটাই তিনি বিনিয়োগ করেন তার মুদির দোকানে প্রয়োজনীয় পণ্য তোলার কাজে। ধীরে ধীরে দোকানে গ্রাহকদের ভিড় বাড়তে থাকে এবং তিনি লাভের মুখ দেখতে থাকেন।

২/৩ ঘণ্টা দোকান বন্ধ রেখে ঋণের কিস্তি পরিশোধে রাঙামাটি শহরে যাতায়াত করতেন

রাসেল। এভাবে দোকান বন্ধ রাখলে তার ব্যবসায় লোকসান হবে ভেবে ডিএফএস নিয়ে বুরোর কর্মীর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। বুরোর কর্মী ঋণ গ্রহণের সময় রাসেলকে বুরোর ডিএফএস সেবা সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। তিনি আগ্রহ দেখানোর পর কর্মীরা শিখিয়ে দেন মোবাইলে কিস্তি পরিশোধের পদ্ধতি।

শিক্ষিত রাসেলের ডিজিটাল লেনদেনে হাতেখড়ির পর আর বেগ পেতে হয়নি। বুরোর ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণ করে দোকানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। বুরোর কয়েকটি কিস্তি ডিজিটালি পরিশোধ করার পর এর সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ডিজিটাল লেনদেনে আগ্রহী করে তোলে রাসেলকে।

তার ভাষায়, 'বুরোর এই সুবিধাটি থাকায় কাজ করা অনেক সহজ হয়ে যায় আমার। দোকানে বসেই নিরাপদে যখন কিস্তি জমা দিতে পারছি, তখন মনে হলো ব্যবসায়িক লেনদেনগুলোও মোবাইলেই করি। আরও অনেক ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সুযোগ যে আছে, তা বুঝতে পারি। বুঝলাম, একটা স্মার্টফোন হলে আরও সুবিধে হবে। আমি বাটন মোবাইলের মাধ্যমে টাকা জমা করতাম। তখন বুরো থেকে কিস্তিতে ভালো স্মার্টফোন নিতে পারবো জেনে একটি স্মার্টফোন নিই। এখন বুরোর সৌজন্যে আমি আরও স্মার্টভাবে লেনদেন করতে পারছি।' ■

মনীষা সেতু হাজং
● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

> ❞ রাসেলের ডিজিটাল লেনদেনে হাতেখড়ির পর আর বেগ পেতে হয়নি। বুরোর ডিজিটাল আর্থিক সেবা গ্রহণ করে দোকানে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। বুরোর কয়েকটি কিস্তি ডিজিটালি পরিশোধ করার পর এর সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ডিজিটাল লেনদেনে আগ্রহী করে তোলে রাসেলকে। ❝

মোহসিন হোসেন খান
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রাজশাহী

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বুরো বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ নেওয়ায় আমরা সত্যিই আনন্দিত। আমি মনে করি এর মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ বেসরকারি উন্নয়ন খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কারণ ডিজিটালাইজেশন যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যধারায় সময়োপযোগী একটি প্রযুক্তি।

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম ডিজিটালাইজড হওয়ায় কাজের ক্ষেত্রে সার্বিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আগে সংস্থার কর্মীদের মাসের প্রথম ও শেষে সাপ্তাহিক শিট লিখতে হতো, এতে করে কর্মীদের অনেক সময় ব্যয় হতো এবং মাঠে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারত না। ফলে সংস্থার কার্যক্রম ব্যাহত হতো। এখন ডিজিটালাইজেশন হওয়ার পর কর্মীদের শিটে লিখতে হয় না। তার ফলে কর্মীরা আগের চেয়ে ভালো সদস্য ভর্তি ও সঠিক ঋণ নির্বাচন করে সঞ্চয় ও ঋণ পোর্টফোলিও অনেক শক্তিশালী করছে।

একজন কর্মী তার সব প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে। এতে করে কর্মীদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরও বেশি আস্থা অর্জন হচ্ছে এবং কাজের মনোবল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্পূর্ণ অটোমেশন হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী তার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সব রিপোর্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছে। যাতে তার কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার করণীয় সম্পর্কে তাৎক্ষণিক অবগত হচ্ছে।

ডিজিটালাইজড করার ফলে প্রায় সব ম্যানুয়াল কাজ এখন অনলাইনে করা যাচ্ছে। ডিজিটালাইজড হওয়ার আগে স্যালারি সার্টিফিকেট, পিএফ ঋণ, ছুটির আবেদন ইত্যাদি ম্যানুয়ালি দিতে হতো, যা এখন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে DFS লেনদেন। যার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষণীয়। DFS এর মাধ্যমে লেনদেন করায় গ্রাহক তার সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি ঘরে বসে জমা করতে পারছে। এতে কর্মীদের গ্রাহকের বাড়িতে গিয়ে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি আনতে হচ্ছে না। যার ফলে কাজ ও অর্থ লেনদেনের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি একজন কর্মী প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কাজে বেশি সময় দিতে পারছে।

আবদুস সালাম
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম

বিশ্বব্যাপী উন্নত প্রযুক্তির এই যুগসন্ধিক্ষণে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের যাত্রাকে আমি আমাদের জন্য আশীর্বাদ মনে করছি। প্রযুক্তি ব্যক্তিজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আমার কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিভাগ দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল। বুরো বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগটিকে ১০টি জেলাসহ ৫টি অঞ্চল ৩৮টি এলাকা ও ১৮৪টি শাখা অবস্থিত। এখানে রয়েছে দেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর, অর্থনৈতিক এলাকা এবং অসংখ্য পর্যটন স্থান। ডিজিটালাইজেশনের ফলে আমাদের কার্যক্রমে অধিক প্রভাব পড়েছে। সুতরাং এই বিভাগের মানুষদের পেশাগত দিক থেকেও রয়েছে ভিন্নতা। এখানে পার্বত্য এলাকায় গভীর জঙ্গল ও অধিক দূরত্বের গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায় ছিল ভীষণ কষ্ট ও জটিল। এখন তা সহজ হয়েছে। এই বিভাগের প্রায় সব জেলায় রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজ নিজ ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য। আমাদের কার্যক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু হওয়ায় সেবার মান ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আমাদের কার্যক্রম ছিল বেশ জটিল ও সময়সাপেক্ষ। এখন তা দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে ডিজিটালাইজেশনের ফলে। এছাড়া আমাদের গ্রাহকরাও এই পদ্ধতিতে ঘরে বসে লেনদেন করতে পারছেন। পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন। ডিজিটালাইজেশন আমাদের কাজকেও সহজ করে দিয়েছে। আমাদের কর্মীরাও দ্রুত কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। এই পদ্ধতিতে কর্মরত সবাই তাদের কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারছেন। অফিসে বসেই কর্মীদের কাজের তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হচ্ছে। কাজগুলো পেপারলেস হয়েছে। গ্রাহকরা ডিএফএসের মাধ্যমে দ্রুত লেনদেন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

মীর মুকুল হোসেন
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনকে আমি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে মনে করি। আমাদের প্রতিষ্ঠান উন্নত বাংলাদেশের সহযাত্রী হওয়ার সুযোগ পেল। ডিজিটালাইজেশন এমন একটি প্রযুক্তি যা মানুষের কার্যক্রমকে সহজ ও স্বচ্ছ করে তোলে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাজে অনেক সময় ব্যয় করতে হতো, এখন সেসব কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে আমরা সেই সময়গুলো প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কাজে ব্যয় করতে পারছি। তৃণমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে কাজ করা হয়। ১. কেন্দ্র পদ্ধতি এবং ২. ব্যক্তি পর্যায়।

কেন্দ্র পদ্ধতিতে একজন মাঠকর্মী একটি নির্দিষ্ট দিনে ১-৩ ঘণ্টার মধ্যে ৮০-১০০ জনকে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে ব্যক্তি পর্যায়ে ১ জন মাঠকর্মী একটি নির্দিষ্ট দিনে ১০-১৫ জনকে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে।

বর্তমানে ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় কর্মীরা একসাথে অনেক গ্রাহকের সাথে সংযোগ রাখতে পারছে। তাদের কাজের ক্ষেত্র বেড়ে গেছে। শুরুতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে দিনের কাজ শেষ করতে প্রায়ই রাত ১২টা বেজে যেত, আবার মাসের হিসাব মেলাতে গিয়ে কখনো রাত শেষে সকাল হয়ে যেত। এখন ফুল অটোমেশন, কর্মীরা লাইভ ট্রানজেকশন করছেন, সন্ধ্যার মধ্যে সব কাজ শেষ, যখন যে রিপোর্ট চাই সাথে সাথেই পাই।

সংস্থার কর্মী ও গ্রাহকরা ডিজিটাল লেনদেন করছেন। কর্মী ও গ্রাহকদের ডিজিটাল লেনদেন সুবিধা নব্বইয়ের দশকে আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। তখন ৭০-৮০% নারীদেরই স্বাক্ষর করা শিখিয়ে ক্ষুদ্রঋণসহ উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হতো। এখন এই ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকরা নিজেরাই স্মার্টফোনের মাধ্যমে ডিজিটালি সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা করছেন। এগিয়ে যাচ্ছে নারী, এগিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর এসবের পেছনে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের যাত্রা সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইস্তাক আহাম্মেদ
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ

দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বুরো বাংলাদেশের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজড হওয়ায় শুধু আমরাই লাভবান হইনি, সংস্থার লাখ লাখ গ্রাহকও এর সুফল পাচ্ছেন। এর ফলে আমাদের কর্মীদের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। আমরা যারা প্রায় শুরু থেকে এ প্রতিষ্ঠানটির সাথে সংশ্লিষ্ট তারা উপলব্ধি করতে পারছি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ করা কত কঠিন ছিল। মূলত ডিজিটালাইজেশন মানেই প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। বুরো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থাই করেছেন। এখন আর শত শত চিঠি হাতে লিখতে হয় না এবং ডাকে পাঠানোর প্রয়োজনও পড়ে না। আমাদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে পারে। ঋণ বিতরণ ও আদায়ের কাজটি তদারকি সহজ হয়েছে। কোন কর্মী কোথায় কোন এলাকায় কোন গ্রাহকের কাছে কত টাকা বিতরণ ও আদায় করল তা ম্যানেজার থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন সবাই দেখতে পাচ্ছে অটোমেশন চালু হওয়ায়। এতে অফিসিয়ালি সবার কাজই অনেক সহজ হয়েছে এবং প্রত্যেকেই এখন অতিরিক্ত সময় প্রতিষ্ঠানের অধিক কাজে মনোযোগ দিতে পারছেন।

এ প্রসঙ্গে অতীতের কথা মনে পড়ে। সাইকেল চালিয়ে ৫-৭ কিলোমিটার গিয়ে ঋণের কিস্তি আদায় করে তা নিয়ে আসা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এখন আমাদের ঋণগ্রহীতারা ডিএফএস লেনদেনের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা করতে পারছে। অর্থাৎ পুরো প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত সহজ হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও তাদের আবেদন সফটওয়্যারের মাধ্যমে করতে পারছেন এবং সিদ্ধান্তও জানাতে পারছেন দ্রুত।

আমাদের সব কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে এবং হিসাবের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি প্রায় শূন্যের পর্যায়ে নেমে এসেছে। এখন আর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট শিটে লিখে পাঠাতে হয় না, সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রেরিত হয়। আগে এ ধরনের কাজে অনেক সময় ব্যয় করতে হতো। ডিভিশনাল কার্যালয়ে বসেও আমরা শাখা পর্যায়ের চিত্র মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি। সফলতা-ব্যর্থতাটুকু নিজেরাই বুঝতে পারছি–অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন আমাদের কার্যক্রমকে যুগান্তকারী ধারায় সংযোজন করে দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় কাজ করতে পেরে মনে হচ্ছে আমরা এখন সত্যিই উন্নত প্রযুক্তির কর্মী হতে পেরেছি।

রফিকুল ইসলাম
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, বরিশাল

বুরো বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় আমি এ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী হিসেবে গভীরভাবে আনন্দিত। কারণ, বর্তমান প্রযুক্তির যুগে ডিজিটালাইজেশন আমাদের মতো বড় ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য। বুরো বাংলাদেশ শুরুর মুহূর্ত থেকেই গণমানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সেবার পাশাপাশি নানামুখী উন্নয়ন সেবা প্রদান করে আসছে। আমাদের সেই কার্যক্রমগুলো ডিজিটালাইজেশনের ফলে অনেক সহজ হয়েছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারার সাথে আমাদের অগ্রযাত্রার বিষয়টিও প্রাধান্য পাচ্ছে।

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমে ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় সব কার্যক্রম যেমন গতিশীল হয়েছে, তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আমাদের কর্মীরা দক্ষতা অর্জন করেছে এবং সে অনুযায়ী তাদের কাজ এখন অনেক সহজ হয়েছে। যখন ম্যানুয়ালি কাজ হতো তখন একজন কর্মীকে কাগজের শিট নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে হতো– কত টাকা কিস্তি আদায় হলো তা লিখে নিয়ে আসতে হতো। কর্মীদের অপেক্ষা করতে হতো। এখন যেকোনো ঋণগ্রহীতা তার কিস্তি অতি সহজেই বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে জমা করতে পারে। তাদের সময় এবং যাতায়াতের ব্যয় দুদিক থেকেই সাশ্রয় হয়। আগে কর্মীদের কোনো বিষয়ে নির্দেশনা দিতে লিখিত সার্কুলার দিতে হতো, এখন তার প্রয়োজন হয় না।

পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তিনির্ভর জাতি গঠনের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে কনজ্যুমার ঋণ সেবা প্রদান করে আসছে। এই সেবার মাধ্যমে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সদস্যরা ঘরে বসে থেকেই কৃষিসেবা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, টেলিমেডিসিন, প্রিয়জনের সাথে যোগাযোগ ও মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক সেবা গ্রহণ করছে। আমাদের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কর্মসূচির আওতায় গ্রাহকরা ঘরে বসে মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সদস্য তার নিজের হিসাবের ব্যালেন্স জানতে পারে। অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশনের ফলে আমাদের কাজ যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীরও দ্রুত সেবা প্রাপ্তির সুযোগ ঘটেছে।

মো. আল-আমিন
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, খুলনা

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল যাত্রাকে আমি মনে করি দেশব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ছোঁয়া স্পর্শ করা। কারণ, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের শাখা বিদ্যমান। অতীতে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে যেকোনো কাজে প্রচুর সময় লেগে যেত- ডিজিটালাইজড হওয়ায় অতি দ্রুত কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। প্রধান কার্যালয় থেকে শাখা পর্যন্ত কাজের দ্রুত নেটওয়ার্ক স্থাপিত হয়েছে। ঋণ বিতরণ ও কিস্তি আদায়সহ সব কাজেই বৈপ্লবিক গতি এসেছে। এখন আর ম্যানুয়ালি চিঠিপত্র আদান-প্রদানে সময় ব্যয় করতে হয় না। কর্মীদের বাহ্যিক কাজের চাপ কম হওয়ায় তারা এখন গ্রাহক সেবা ও কর্মপরিধি বৃদ্ধিতে মনোযোগ দিতে পারছে। ফলে কর্মএলাকার মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়াও এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য অর্থ যোগানের একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ সহজেই এমএফএস পদ্ধতিতে বুরো বাংলাদেশের শাখাগুলোতে জমা রাখার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। আগে সঞ্চয় জমা করার জন্য শাখায় যেতে হতো এখন সঞ্চয় জমা করার জন্য যেতে হয় না, বাড়িতে বসে সঞ্চয় জমা রাখার ক্ষেত্র তৈরি হওয়াতে এখন অনেক স্বল্প আয়ের মানুষ বেশি বেশি সঞ্চয় জমা রাখছেন। এতে করে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ মোকাবিলায় এক ধরনের শক্তি তৈরি হচ্ছে। অনেক নারী সদস্য বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে নিজে ব্যবসা করছেন, নারী উদ্যোক্তা হয়েছেন। অনেক নারী সদস্য আছেন যারা আজকে সফলভাবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। এতে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ডিজিটালাইজেশনের ফলে এই কার্যক্রম আরও বেগবান হয়েছে।

টুটুল চন্দ্র পাল
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রংপুর

বর্তমানে তথ্যের আদান-প্রদানসহ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকি। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে আমাদের কাজের ধরনও পাল্টে গেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি সংস্থা এবং কর্মীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান কমিয়েছে। সংস্থার সব স্তরের কর্মীদের কাজের দক্ষতার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সংস্থার কর্মীরা আগে নিজেদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ম্যানুয়ালি সম্পাদন করতেন কিন্তু এখন সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করায় সময় এবং শ্রম দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে। এই সাশ্রয়কৃত সময় ও শ্রম কর্মীরা নিজেদের অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যয় করে সংস্থার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। ম্যানুয়ালি আদায় বিবরণী ও রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক একটি কাজ ছিল। এ কাজে প্রায়শই গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে কর্মীদের কষ্ট লাঘব করে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি করেছে। প্রযুক্তিগত বিষয়ে যুগোপযোগী দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মীগণ নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হচ্ছেন। আর্থিক অনিয়ম রোধেও ডিজিটাল প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়্যাল প্রকল্পের মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের সদস্যরা মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে সহজেই ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয়ের টাকা নিজ নিজ হিসাবে জমা করতে পারছেন। এতে গ্রাহকের সময় সাশ্রয় হচ্ছে এবং নিজেই আর্থিক লেনদেনের সঠিকতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছেন। কাগুজে টাকার পরিবর্তে ডিজিটাল অর্থের ব্যবহার নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি হ্রাস করে কর্মীর মানসিক প্রশান্তি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা বোধ করছেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি সংস্থার অর্থের অপব্যয় রোধ করে ব্যয় যৌক্তিককরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে কাগজের ব্যবহার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, তথ্য সংগ্রহ ও দীর্ঘমেয়াদে তথ্য সংরক্ষণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসের পরিবর্তে প্রতিটি শাখায় ই-মেইলের ব্যবহারের কারণে বিভিন্ন চিঠিপত্র তাৎক্ষণিক আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই যোগাযোগসহ তথ্যের আদান-প্রদান, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্দেশনা প্রদান সহজতর হয়ে উঠেছে। শাখায় টাকার প্রবাহ গতিশীল রাখতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে দ্রুত চাহিদা প্রেরণ সম্ভব হচ্ছে এবং চাহিদা মাফিক টাকা সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়্যারে সংস্থায় কর্মীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন তথ্য বা কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাৎসরিক কর্মী মূল্যায়নের কাজ সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়ায় নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে।

মুস্তাফিজুর রহমান
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা উত্তর

১৯৯০ সালে বুরো বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান বরাবরই সময় ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের কার্যক্রমকে আপগ্রেড করেই এগিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বুরো বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে আমাদের কার্যক্রমে ব্যাপক গতির সঞ্চার হয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সহজ করে দিয়েছে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আমাদের কার্যক্রমে কিছুটা মন্থর গতিতে চললেও ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে বলা যায় দ্রুতগতির ট্রেন।

ডিজিটালাইজেশনের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক গতির সঞ্চার হয়েছে। বিভিন্ন ডিএফএস ও ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতারা কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন। তাদের যেমন শাখায় আসার প্রয়োজন হয় না, তেমনি কর্মীরাও ফোনের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। আগে কোনো কর্মীর পারফরমেন্স কেমন তা জানতে ফাইল দেখতে হতো, এখন তার ফাইল ওপেন করলেই জানা যায়। চিঠিপত্র লেনদেন করতে হয় না, সবই এখন কম্পিউটারের মাধ্যমেই নির্দেশনা জারি করা যায়, তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। কর্মীদের যেকোনো প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়। স্মার্টফোন, ট্যাব-ডিভাইস ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে ডিএফএসের মাধ্যমে সংস্থার ঋণের কিস্তিরও সঞ্চয় করতে পারে। সংস্থার ডিজিটালাইজেশন কর্মী ও সদস্যদের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিয়ম অনেকাংশেই কমে গিয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা আনয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও অনলাইন সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন ব্যবসা, কৃষিকাজসহ যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সদস্যরা মোবাইল/অনলাইন থেকে পাচ্ছে।

অর্থাৎ বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশনের প্রভাব সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যেও বাড়ছে। আমাদের কর্মীরা যেমন স্মার্ট হচ্ছে, গ্রাহকরাও তেমনি এর ছোঁয়ায় স্মার্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় কাজ সম্পাদন হচ্ছে নির্ভুলভাবে এবং দ্রুততার সাথে। ভাবতেই ভালো লাগে দেশের উন্নয়নে ও বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশ হওয়ার অগ্রযাত্রায় বুরো বাংলাদেশও বড় অংশীদার। কর্মী এবং সদস্যদের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিয়ম অনেকাংশেই কমে গিয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা আনয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে এবং বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকেও অগ্রসর হচ্ছে।

ডিএফএস

দূরত্ব এখন আর বাধা নয়

আমিনুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। বাবা-মা, স্ত্রী ও পুত্র সন্তান নিয়ে তাদের সুন্দর ও সুখী পরিবার। তার স্ত্রী সাংসারিক কাজের পাশাপাশি লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছেন। কুয়াকাটা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি দূরে তাদের বাড়ি। প্রথম দিকে ছোট একটি ভুষির ব্যবসা ছিল তার। ব্যবসায় আর্থিক চাহিদাও ছিল অনেক বেশি। কিন্তু যাতায়াত বৈরিতা এবং অধিক সময় ও বাড়তি খরচের কারণে কোনো ঋণ না করে ধৈর্য সহকারে তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। একদিন তার শ্বশুরবাড়ির মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের সাথে পরিচয় ঘটে। সেই থেকে ঋণ গ্রহণের চিন্তা করলেও শাখা থেকে বাড়ির দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের বেশি হওয়ায় যাতায়াতের ঝামেলা ও প্রতিবার ২০০ টাকারও বেশি খরচের কথা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিষয়ে জানতে পেরে তিনি যেন বড় একটি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হন।

আমিনুল ইসলাম
শাখা : কুয়াকাটা
আমতলী, বরিশাল
সমিতি নং-২০০৪
সদস্য নং- ০০৯৩৭

পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত মহিপুর থানাধীন প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি গ্রাম বরকোতিয়া। এই গ্রামে বসবাস করেন বুরো বাংলাদেশের কুয়াকাটা শাখার সদস্য আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলাম পেশায় একজন ব্যবসায়ী। বাবা-মা, স্ত্রী ও পুত্র সন্তান নিয়ে তাদের সুন্দর ও সুখী পরিবার। তার স্ত্রী সাংসারিক কাজের পাশাপাশি লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছেন। কুয়াকাটা থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটারের বেশি দূরে তাদের বাড়ি। যোগাযোগব্যবস্থা ভালো না হওয়া এবং যাতায়াতে বেশি খরচ হওয়ার কারণে ব্যবসায়িক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও শুরুতে কোনো এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম দিকে ছোট একটি ভুষির ব্যবসা ছিল তার। তাই ব্যবসায় আর্থিক চাহিদাও ছিল অনেক বেশি। কিন্তু যাতায়াত বৈরিতা এবং অধিক সময় ও বাড়তি খরচের কারণে কোনো ঋণ না করে ধৈর্য সহকারে তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে গেছেন। এভাবেই চলছিল আমিনুল ইসলামের প্রাত্যহিক জীবন। একদিন তার শ্বশুরবাড়ির মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশের সাথে পরিচয় ঘটে। সেই থেকে ঋণ গ্রহণের চিন্তা করলেও শাখা থেকে বাড়ির দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের বেশি হওয়ায় যাতায়াতের ঝামেলা ও প্রতিবার ২০০ টাকারও বেশি খরচের কথা চিন্তা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। পরবর্তীতে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিষয়ে জানতে পেরে তিনি যেন বড় একটি মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হন। বর্তমানে বিগত তিন বছর ধরে আমিনুল ইসলাম বুরো বাংলাদেশের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথমে গরু-ছাগলের খাবার ভুষির ব্যবসা শুরু করলেও বর্তমানে তার ব্যবসা পরিস্থিতি অনেক ভালো। এখন ভুষির পাশাপাশি কীটনাশক, সার, খুচরা ডিজেল ও পেট্রোলের ব্যবসা খুব ভালোভাবেই পরিচালনা করছেন।

আমিনুল ইসলাম বুরো বাংলাদেশের ডিএফএস কার্যক্রমে অত্যন্ত খুশি। তিনি তার বিকাশ অ্যাকাউন্টে ব্যবসা থেকে যে টাকা আসে সেই টাকা দিয়েই তার ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় জমা করেন। অন্যদিকে তার প্রতি মাসে কিস্তির টাকার জন্য তেমন ভাবতেও হয় না। তিনি তার বিকাশ অ্যাকাউন্টে যখন যা পারেন তাই সঞ্চয় করেন। তারপর একসাথে বুরো বাংলাদেশের কিস্তির টাকা ডিজিটালি প্রদান করেন। এতে করে তিনি যেমন স্বস্তি পাচ্ছেন তেমনি খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি থেকেও মুক্ত হচ্ছেন। তার ভাষায়, 'বুরো বাংলাদেশের স্যাররা অনেক দূর থেকে কিস্তি নিতে আসে। মাঝেমধ্যে আমি থাকি না। আবার অনেক সময় গোছানো টাকাও খরচ হয়ে যায়। ফলে আমার কিস্তি মিস হয়ে গেলে আমি তো খারাপ সদস্য হয়ে যাবো।

ডিএফএসে কীভাবে টাকা পাঠাতে হয় তা স্যাররা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। খুবই সহজ একটা পদ্ধতি। শুধু শাখার ডিএফএস নম্বর আর আমার ঋণের হিসাব নম্বর দিয়ে টাকার পরিমাণ দিলেই সব টাকা একসাথে বুরো বাংলাদেশে আমার সব হিসাবে চলে যায়। এমনকি ওই নম্বরগুলো বারবার দেওয়াও লাগে না। সেভ করে রাখা যায়। তাই আমার টাকা এখন আমি নিজেই দিই। জমা হলো কি না তা আমি নিজেই দেখতে পারি। ফলে টাকা জমা হওয়ার বিষয়ে আমার আর কোনো চিন্তাই থাকে না। আমার সঞ্চয়ে কত জমা হলো বা ঋণের আর কত টাকা বাকি থাকল এসব জানার জন্য আমি স্যারদের কাছেও ফোন দিই না। আমারটা আমি নিজে নিজেই দেখে নিই। এই সিস্টেম এসে আপনাদের আর কি লাভ হয়েছে জানি না, তবে তার থেকে বেশি লাভ হয়েছে আমার। আমি আমার মতো করে বিকাশে টাকা রাখি, আর কিস্তির সময় হলে কিস্তি দিয়ে দিই। যখন স্যার আসে তখন বইয়ে লিখে নিই। ব্যস, কিস্তিও শোধ হচ্ছে আবার কষ্টও হচ্ছে না।'

আমিনুল ইসলাম বুরো বাংলাদেশের কাছে কৃতজ্ঞ। তার মতে যদি বুরো বাংলাদেশে এই ধরনের সুবিধা না থাকত তা হলে হয়তো বুরো বাংলাদেশের সাথে তিনি সম্পৃক্ত হতেন না। ফলে তার ব্যবসা বড় করতে আরও অনেক বেশি সময় লাগত এবং অনেক কষ্ট হতো। তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে প্রথমবার এক লক্ষ টাকা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে আবারও ঋণ নিয়েছেন। এখন তিনি ঋণ নেওয়ার বিষয়টি ঝামেলা মনে করেন না। বুরো বাংলাদেশে ডিএফএস চালুর কারণে তিনি ঋণ পরিশোধের পাশাপাশি সঞ্চয় জমা করতে পারছেন যা আগে কখোনই তিনি করতে পারেননি। তিনি সবসময় সবার সাথে বুরো বাংলাদেশের এই ডিজিটাল সেবার বিষয়ে আলোচনা ও প্রশংসা করেন।

এভাবেই সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা হাজারো আমিনুল ইসলামের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের মাধ্যমে এক নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। ■

মো. শাহ্ আলম

● ব্যবস্থাপক-ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস
বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়

জিয়াউল সিদ্দিকী

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বরিশাল

ক্ষুদ্র অর্থায়নে ডিজিটাল যাত্রায় বুরো বাংলাদেশ কাগজপত্রের ব্যবহার কমিয়ে গ্রাহক সেবাগুলো সহজ ও দ্রুততর করছে। সদস্যসহ অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানতে ও সেবা গ্রহণ করতে পারেন। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকরা সঞ্চয়, ঋণ ও রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য সেবা গ্রহণ করতে পারছে। কৃষি, প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি প্রযুক্তি সংক্রান্ত সব তথ্য কৃষি হটলাইনের মাধ্যমে কৃষকরা ঘরে বসেই নিতে পারছে। এছাড়াও সদস্যরা যেকোনো জায়গা থেকে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের (ডিএফএস) মাধ্যমে সহজেই স্বল্প খরচে সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান করতে পারছে, সঞ্চয় ও ঋণের স্থিতিসহ লেনদেন সংক্রান্ত সব তথ্য তাৎক্ষণিক দেখতে পারছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে নগদ লেনদেনের ঝুঁকি কমেছে, বাড়ছে গ্রাহক পর্যায়ে সন্তুষ্টি। হিসাবে এসেছে স্বচ্ছতা, বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা। ডিজিটাল অগ্রযাত্রা গ্রাহক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয় ছড়িয়েছে সংস্থা তথা কর্মী পর্যায়েও। বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কর্মীপ্রতি কাজ করার ক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা ও সেবার মান। সরাসরি অনলাইনের মাধ্যমে সদস্য জরিপসহ সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি কালেকশন করার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (কাগজ, কলম ও সময়) হ্রাস পেয়েছে। ডিজিটালাইজড হওয়ার ফলে যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় বসে সফটওয়্যারে সব তথ্য/রিপোর্ট মনিটরিং ও ফলোআপ করা সহজ হয়েছে, যার ফলে কাজের গুণগত মান ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। অল্প সময়ে সঠিক ও নির্ভুলভাবে রিপোর্ট তৈরি এবং সফটওয়্যার থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিকভাবে রিপোর্ট দেখে কর্মসূচির অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের পরিস্থিতি দেখে সহজেই পদক্ষেপ নেওয়া যাচ্ছে।

ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে বিশেষ করে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যায়ে। ডিজিটালাইজেশনে ডেটার গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সাইবার হুমকি থেকে রক্ষাসহ ডিজিটাল সিস্টেমগুলো সুরক্ষিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

কামাল হোসেন
বিভাগীয় প্রধান, প্রশিক্ষণ বিভাগ

বিশ্বে আজ দ্রুতগতিতে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে এবং বুরো বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক ডিজিটাল অগ্রগতি থেকে পিছিয়ে নেই। গ্রাহকদের দ্রুত ও সহজেই সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে এবং কর্মীদের প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের জন্য নিয়মিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুরো বাংলাদেশ শুরু থেকেই নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে।

সংস্থার শুরুতেই প্রশিক্ষণে পোস্টার পেপার বা ফ্লিপ চার্ট হাতে লিখে সেশন পরিচালনা করা হতো। অসুবিধা ছিল প্রত্যেক প্রশিক্ষক ফ্লিপ চার্ট লিখতে পারতেন না কারণ এখানে ভালো হাতের লেখার একটা ব্যাপার ছিল। এছাড়াও কোনো একটি শব্দ ভুল হলে আবার লিখতে হতো এবং আপডেট করার কোনো সুযোগ ছিল না। তারপর প্রশিক্ষণে ওভারহেড প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয়। এই প্রজেক্টরে ট্রান্সপারেন্ট শিটে লিখে লিখে ব্যবহার করা হতো, অবশ্য পরবর্তীতে প্রিন্ট করে ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণে শিখন সহায়ক হিসেবে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করা হয় এবং বর্তমানে সংস্থার প্রত্যেকটি মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রশিক্ষণে ইন্টারেক্টিভ প্যানেল ব্যবহার করা হচ্ছে, যা একসাথে বোর্ড ও প্রজেক্টর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এখন খুব সহজেই শিখনে সহায়ক ছবি, অডিও-ভিডিও ব্যবহার করে সেশনকে প্রাণবন্ত করা হচ্ছে।

বর্তমানে বুরো বাংলাদেশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। আমাদের প্রশিক্ষকদের অনেক দিন থেকে ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সুবিধা থাকায় প্রশিক্ষণে শিখন সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। সংস্থার কর্মীদের প্রশিক্ষণে সফটওয়্যার বা অন্যান্য আইসিটি সেশনে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পৃথক ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে ব্যবহারিক সেশন পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও সংস্থার সব কর্মীদের ল্যাপটপ/ট্যাব থাকায় বর্তমানে প্রশিক্ষণে হ্যান্ডআউট/রিডিং ম্যাটেরিয়াল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রিন্টকপি না দিয়ে সফটকপি দেওয়া হচ্ছে, এতে কাগজের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। বর্তমানে ফিজিক্যালি ও ভার্চুয়ালি দুভাবে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ করানো হচ্ছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স লাইভে দেওয়া থাকে যাতে সংস্থার এলাকা ব্যবস্থাপক থেকে উর্ধ্বতন যেকোনো কর্মী যেকোনো স্থান থেকে লাইভ সেশন দেখতে পারেন। এছাড়াও প্রত্যেকটি সেশন প্রশিক্ষণ বিভাগের নিজস্ব ইন্টারনাল পোর্টালে সেভ করা থাকে এবং প্রশিক্ষকরা তার সুবিধাজনক সময়ে সেশন দেখে ফিডব্যাক দিতে পারেন। এভাবে ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণরা নিজেকে উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে তুলছেন।

প্রতিটি প্রশিক্ষণে শিখনের মান উন্নয়ন ও প্রশিক্ষকদের সেশন পরিচালনার ফিডব্যাক নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়ন বর্তমানে ডিজিটালি নেওয়া হচ্ছে যাতে ইন্টারনাল পোর্টালে প্রত্যেক প্রশিক্ষক মূল্যায়ন দেখতে পারেন এবং নিজেকে সংশোধনের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। বর্তমানে প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রতিটি সিএইচআরডির হিসাব ব্যবস্থাপনার জন্য সিএইচআরডি সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। সিএইচআরডি এর সেবা গ্রহণের জন্য সিএইচআরডি বুকিং ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের উন্নয়নের জন্য আরও সফটওয়্যার তৈরি চলমান রয়েছে। ■

কাজল সরকার
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক

কামরুল আহসান
কর্মকর্তা

আবুল বাশার
সহকারী কর্মকর্তা

নূরুন্নাহার মুন্নী
প্রশিক্ষক

একটা সময় প্রতি মাসের শুরুতে কর্মীদের প্রতিটি কেন্দ্রের সঞ্চয় ও ঋণের আদায় বিবরণী কাগজে-কলমে লিখতে হয়েছে। আবার প্রতিটি কেন্দ্রের মাসিক কাজ শেষে বিতরণকৃত ঋণ, সদস্যদের জমানো সঞ্চয়ের উত্তোলনসহ আদায় বিবরণীর সমাপনীও করতে হয়েছে। পাশাপাশি শাখার সব মাসিক প্রতিবেদন কর্মীদের হাতে লিখে তৈরি করতে হয়েছে। এতে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, কর্মীদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে শাখার সব কর্মীরা ট্যাবে কালেকশন করছে। ট্যাবে পোস্টিং দিলেই অনলাইনে অটো রিপোর্ট তৈরি হচ্ছে, মাস শেষে কাগজে-কলমে লিখে শাখার কোনো প্রতিবেদন করতে হয় না। বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি শাখা এখন পেপারলেস।

বুরো বাংলাদেশের প্রতিটি নতুন কর্মী প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মস্থলে যোগদান করে। প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে কর্মীদের প্রশিক্ষণে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংস্থায় ব্যবহারকৃত কোর সফটওয়্যার জি-ব্যাংকারে কালেকশন প্রক্রিয়া ট্যাবের মাধ্যমে কীভাবে করতে হয় তা প্রথমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ধারণা দেওয়া হয় এবং রিপোর্টিং কীভাবে করতে হয় এ বিষয়ে হাতে-কলমে শেখানো হয়। এছাড়া সংস্থায় ব্যবহারকৃত বিভিন্ন রিপোর্টিংসহ অন্যান্য সফটওয়্যারের কার্যক্রম শেখানো হয়। এরপর প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের ফিল্ডে পাঠিয়ে শাখায় কর্মরত পুরোনো কর্মীদের সাথে ট্যাবের মাধ্যমে কালেকশন প্রক্রিয়া ও অন্যান্য রিপোর্টিং শেখানো হয়।

বুরো বাংলাদেশের ৯টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রতিটি অঞ্চলে রয়েছে দক্ষ আইসিটি টিম। প্রশিক্ষণ বিভাগ ও আইসিটি টিম প্রতিটি শাখার কর্মীদের নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। প্রশিক্ষণ বিভাগে দুই ধরনের ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ১. সফট উপকরণ। ২. হার্ড উপকরণ। ভিডিও ক্লিপ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, অনলাইন ছবি, ইন্টারঅ্যাকটিভ হোয়াইট বোর্ড হলো সফট উপকরণ। অপরদিকে হার্ড উপকরণগুলো হচ্ছে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, টি-স্ক্রিন, মোবাইল, ট্যাব, সাউন্ডবক্স, ক্যামেরা, পয়েন্টার, পেনড্রাইভ ইত্যাদি।

প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ চলাকালীন ডিজিটাল পদ্ধতিতে Microsoft Teams- এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণের লাইভ দেখানো হয় এবং সেই লাইভের লিংক পরিচালকবৃন্দ, প্রত্যেক বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এবং আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের শেয়ার করা হয়। প্রশিক্ষণের লাইভ রেকর্ড করা থাকে, ইচ্ছে করলে পরবর্তীতে ভিডিও দেখা যায়।

প্রশিক্ষণে ডিজিটালাইজেশনের ফলে কর্মী ও সদস্য উভয়েই বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর একজন কর্মী কিংবা সদস্য চলতি বিষয়ের ওপর সক্ষমতা অর্জন করতে পারছেন। বুরোর সদস্যরা নিজেই মোবাইল ব্যবহার করে বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে টাকা লেনদেন করতে পারছেন। বাড়িতে বসে তারা সঞ্চয় ও ঋণের টাকা লেনদেন করছেন, এসএমএসের মাধ্যমে ঋণ ও সঞ্চয়ের ব্যালেন্স দেখতে পারছেন। সদস্য তার লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে পারছেন। সফটওয়্যারে সব তথ্য লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে কাগজপত্রের জন্য হয়রানিও কম হতে হচ্ছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে বুরো বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে সংস্থার প্রতিটি কার্যক্রম ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে হচ্ছে। Digital skills training attracts and retains talen. সুতরাং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন ছাড়া কোনো সংগঠন টিকে থাকতে পারবে না। মূলত এ লক্ষ্যেই প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রশিক্ষণের উপকরণ থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আরও বেশি সংখ্যক গ্রাহকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক

প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রশিক্ষকবৃন্দের জন্য রয়েছে একটি অত্যাধুনিক অনলাইন পোর্টাল। এ পোর্টালের মাধ্যমে প্রশিক্ষকরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, রয়েছে অনলাইন লাইব্রেরি-যার ভেতর রয়েছে অগণিত ই-বুক, প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল উপকরণ (অডিও, ভিডিও, ডকুমেন্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রভৃতি), প্রশিক্ষণের হালনাগাদ হ্যান্ডআউট, প্রশিক্ষণের সিডিউল, সংস্থার সার্কুলার, সংস্থায় প্রচলিত বিভিন্ন সফটওয়্যার লিংক, সব শাখার যোগাযোগের ঠিকানা ও নাম্বার, প্রশিক্ষক কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন নতুন নতুন পদ্ধতি ও উপকরণের বিবরণ, লাইভ ট্রেনিং সেশনের লিংক, CHRD সমূহের বিভিন্ন অনলাইন রিপোর্ট প্রভৃতি।

প্রশিক্ষণে এখন QR কোড সংবলিত তথ্যবহুল ডিজিটাল ই-হ্যান্ডআউট প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন করেন অনলাইন মাধ্যমে। QR কোড স্ক্যান করে বা লিংকে ক্লিক করে নিজের মোবাইল থেকেই প্রদান করতে পারেন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষক সম্পর্কিত নিজের সব মতামত। যা প্রশিক্ষণ বিভাগকে দিন দিন সমৃদ্ধ ও উন্নত করছে।

প্রশিক্ষণ বিভাগের জন্য আইসিটি বিভাগ তৈরি করছে একটি পূর্ণাঙ্গ অনলাইন পোর্টাল, যার মাধ্যমে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের সব তথ্য তাদের প্রোফাইলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে হালনাগাদ হবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ প্লান, প্রশিক্ষণ সিডিউল, প্রশিক্ষক মূল্যায়ন, ফিডব্যাক প্রদান, প্রশিক্ষণ মডিউল, ডিজিটাল সার্টিফিকেট, অনলাইন পরীক্ষা, প্রশিক্ষণার্থী মূল্যায়ন, অনলাইন ট্রেনিং প্রভৃতি এই পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ■

গ্রাহক স্পন্দন অনুভব করার আদর্শ উপায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

সাজিদ হাসান

প্রযুক্তি আমাদের যোগাযোগের পদ্ধতি, আমাদের মিথস্ক্রিয়া এবং আমাদের সামাজিক সংযোগের ভিত্তিকে গভীরভাবে পরিবর্তন করেছে। ইন্টারনেট এবং মোবাইল প্রযুক্তির আবির্ভাব ভৌগোলিক বাধাগুলো ভেঙে দিয়ে তাৎক্ষণিক এবং সর্বব্যাপী যোগাযোগের উপায় তৈরি করে বিশ্বব্যাপী কথোপকথনকে সম্ভব করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো আমাদের সামাজিক গতিশীলতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা আমাদের একটি অভূতপূর্ব পরিমাণে তথ্য ব্যবহার, প্রকাশ এবং প্রচার করতে দিয়েছে। বার্তা আদান-প্রদানকারী অ্যাপ এবং ভিডিওকল দূরত্ব এবং সময়ের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বের যেকোনো স্থানে যে কারও সাথে রিয়েলটাইম, মুখোমুখি যোগাযোগকে সহজ করে তোলে। প্রযুক্তির এই রূপান্তর ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থাপনা, তথ্য গোপনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ এবং আমাদের মানসিক সুস্থতার ওপর নতুন চ্যালেঞ্জ এবং জটিলতারও সূচনা করে। প্রযুক্তির বিকাশ অব্যাহত থাকায় এটি ক্রমাগত মানব যোগাযোগকে নতুন আকার দেয়, সংযোগ এবং বোঝাপড়ার জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে, পাশাপাশি সমাজের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করে।

সময় যত অতিক্রান্ত হয়, প্রযুক্তির অগ্রগতি ততই ত্বরান্বিত হয়। গত এক দশকে প্রযুক্তি যতদূর এগিয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বিভিন্ন রকম উদ্ভাবন প্রযুক্তির উত্থানকে হয়তো তার চেয়ে আরও কয়েকগুণ গতিশীল করবে এবং যেহেতু যোগাযোগ এখন প্রায় পুরোপুরি প্রযুক্তিনির্ভর, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে আমাদের যোগাযোগের ধরনও দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। ইন্টারনেট এবং স্মার্টফোনের মতো প্রযুক্তির উত্থানের কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগের জন্য একটি মূল উপায়। গ্রাহকদের সাথে সরাসরি এবং দ্রুত কথা বলতে, তাদের প্রয়োজন বুঝতে এবং নিজেদের সংস্থার একটি অনলাইন পরিচয় তৈরি করতে, আজকের বিশ্বে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সক্রিয় থাকা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রাহকদের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য অপরিহার্য। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হচ্ছে জনসম্পৃক্ততা।

> সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আধুনিক সামাজিক ভূ-চিত্রের একটি স্থায়ী পটভূমি এবং এই বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়েই যেকোনো সংস্থাকে তাদের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে হবে। প্রাসঙ্গিক এবং উদ্ভাবনমূলক থাকার জন্য এটি অপরিহার্য।

বাংলাদেশ এখনও তরুণদের দেশ। আগামী কয়েক দশকে এই প্রাণবন্ত তরুণরাই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড হিসেবে আবির্ভূত হবে, আর্থিকভাবে সক্ষম জনসংখ্যায় রূপান্তরিত হবে এবং তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোই অর্থনীতি এবং বাণিজ্যকে আকার দেবে। এই জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তাদের স্ক্রিন টাইম (মোবাইল বা কম্পিউটারের পেছনে ব্যয়কৃত সময়), যা ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাদের গভীরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রমাণ। মুঠোফোনের পর্দায় চোখ লেগে থাকার প্রবণতা তাদের জীবনধারা এবং দর্শনের একটি মৌলিক দিক। এই প্রবণতার ভালো বা খারাপ বিবেচনা করা আমার মতে অপ্রাসঙ্গিক। এটি অনস্বীকার্য সত্য যে, মুঠোফোন তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আধুনিক সামাজিক ভূ-চিত্রের একটি স্থায়ী পটভূমি এবং এই বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়েই যেকোনো সংস্থাকে তাদের জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে হবে। প্রাসঙ্গিক এবং উদ্ভাবনমূলক থাকার জন্য এটি অপরিহার্য।

শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে উপস্থিতি বজায় রাখাই নয়, বরং গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের অন্যান্য উপায়গুলো বোঝা, তাদের কথা শোনা, তাদের সাথে কথা বলা এবং গ্রাহকদের অভ্যাস এবং চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এমন একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আমাদের তরুণ প্রজন্ম ডিজিটাল বা সাইবার স্পেসে দিনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করে, সাইবার স্পেসে নিজেদের জায়গা তৈরি করে নেওয়া যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রাহকদের সাথে যেকোনো সংস্থার নিবিড়ভাবে সংযোগ স্থাপনের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি আদর্শ বাহন। বুরো বাংলাদেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, কেবল সচেতনতা সৃষ্টিই নয়, গ্রাহকদের মতামত, পরামর্শ, অভিযোগ ইত্যাদি তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমাদের কাছে অকপটে বলতে পারেন। এর ফলে আমাদের গ্রাহকদের এই কথাগুলো আমাদের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, যা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছাড়া হয়তো তাদের জন্য অকল্পনীয় ছিল। বাৎসরিক প্রায় চার হাজার অনুসন্ধান প্রসেস করে থাকে আমাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিম। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্রও বটে।

এছাড়াও বুরো বাংলাদেশের সঞ্চয়, ঋণ এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল পরিষেবাগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন সেবাগুলো কাজে

লাগানো হয়। ইনফোগ্রাফিক্স, সংক্ষিপ্ত ভিডিও এবং ইন্টারেক্টিভ পোস্টের মতো ফরমেটগুলো মিশ্রভাবে ব্যবহার করে আমরা একটি তথ্যপূর্ণ এবং গ্রাহকদের জন্য একটি সহজগম্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার কাজ করে চলছি। যেহেতু আমাদের গ্রাহকদের একটি বড় অংশই ফর্মাল ফাইন্যান্সিয়াল পরিষেবার আওতার বাইরে, তাই জটিল আর্থিক ব্যবস্থাপনার ধারণাগুলোকে সরল করে বিভিন্ন সচেতনতামূলক বার্তা গণমানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও বিস্তৃত করাই আমাদের লক্ষ্য। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিম শুধু বুরো বাংলাদেশের পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গ্রাহকদের আর্থিক স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি করে এবং সচেতন আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শুধু আর্থিক পরিষেবাই নয়, বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সেবাগুলোর গ্রাহকরাও ডিজিটাল যোগাযোগ দ্বারা উপকৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০ হাজারেরও বেশি প্রান্তিক কৃষক আমাদের কৃষি টিমের সাথে ডিজিটালি জড়িত, যাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট সার্ভিসের অংশ হিসেবে বার্তা আদান-প্রদান অ্যাপের মাধ্যমে কৃষি উপদেশ পৌঁছে দেওয়া হয়। পরিশেষে, সারা দেশজুড়ে বুরো এমন অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করেছে, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন সর্বোপরি গণমানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং এসব অবকাঠামো সাধারণ মানুষের কাছে বুরোর প্রতিনিধিত্ব করে, বুরোর কাজের জানান দেয়। যোগাযোগ প্রযুক্তির এই যুগে, যখন তরুণ প্রজন্মের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো তথ্য বা আইডিয়া শেয়ারের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম ও যোগাযোগের জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় মাধ্যম, তখন আমাদের আগামী প্রজন্মের কাছে বুরো বাংলাদেশের কাজ পৌঁছে দিতে, বুরোর ভিশন ছড়িয়ে দিতে অনলাইন স্পেস বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে বুরো বাংলাদেশের একটি সামাজিক অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব। ■

● ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি ও টিম লিডার
সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন
বুরো বাংলাদেশ

বুরো বাংলাদেশের গ্রাহক সেবা

তথ্যসেবা

টেলিফোন– ৫০০০+
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম– ৫০০০+

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির হার– ১২৯%
[২০২২ বনাম ২০২৩]

অভিযোগ

নিষ্পত্তির হার– ৯০%
[৩০ দিন সময়সীমার মধ্যে]

বুরোর ডিজিটাল কৃষিসেবা

এবিএম তাজুল ইসলাম

বাংলাদেশের কৃষিতে যেমন অনেক সুযোগ আছে তেমনি অনেক চ্যালেঞ্জও রয়েছে। দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০-৪৫ শতাংশ কৃষি ক্ষেত্রে কাজ করছে। ১৭ কোটি মানুষের এ দেশ। আমরা আয়তনের (৯৪তম) দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও জনসংখ্যার (৮ম) দিক থেকে ব্যাপক এগিয়ে। এর মধ্যে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যোগ হয়েছে জলবায়ুর পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে আমাদের স্থানীয় আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয়েছে যা বাংলাদেশের কৃষিতে নানাবিধ বিরূপ প্রভাবসহ খাদ্য উৎপাদনে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে তা সত্ত্বেও আমরা কৃষিতে এগিয়ে যাচ্ছি। যদিও আমাদের কৃষি উৎপাদনের তথ্য নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে এবং আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রায় কাছাকাছি আছি বলে দাবি করছি কিন্তু বাস্তবে ধান এবং আলু ছাড়া আর কোনো ফসলে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। কারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সব খাদ্যপণ্যই আমাদের কম-বেশি আমদানি করতে হয়।

দেশের কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার খুব কম। এখনও কৃষি কার্যক্রমের বহুক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। আধুনিক কৃষি গবেষণা, ফলাফল এবং এর বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য আমাদের রয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির বিস্তারের সঠিক মাধ্যম ব্যবহার করতে না পারায় কৃষক সে তথ্য ঠিকমতো পাচ্ছেন না। মোবাইলকে ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে কৃষকের কৃষি কারিগরি তথ্য এবং কৃষি-প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধিকরণসহ কৃষককে আর্থিক সেবা প্রদান ও উপযুক্ত মূল্যে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ের সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানের অনেক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

আমাদের দেশে প্রায় ১২ কোটি মানুষ মোবাইল ব্যবহার করে। আধুনিক বিশ্বে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বিশ্বের ১২০টি দেশে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং গবেষণা ফলাফলে তারা দেখেছে কোনো দেশে যদি ১০ শতাংশ মোবাইলের ব্যবহার বাড়ে, তা হলে ওই দেশে ১ শতাংশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ে।

> মোবাইলকে ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে কৃষকের কৃষি কারিগরি তথ্য এবং কৃষি-প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধিকরণসহ কৃষককে আর্থিক সেবা প্রদান ও উপযুক্ত মূল্যে কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ের সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে কৃষকের জীবনমানের অনেক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

ডিজিটাল কৃষি যাত্রার শুরুর কথা

এপ্রিল ২০২০ করোনা মহামারি চলাকালীন লকডাউনের এক সকাল, জামালপুর থেকে একজন সদস্য বুরো কৃষি বিষয়ক হটলাইন নাম্বারে ফোন করে তার পানের জমির সমস্যা নিয়ে পরামর্শ চান কিন্তু কোনোভাবেই সম্যসাটি ভালোভাবে বোঝাতে পারছিলেন না, ফলে সমস্যা যথাযথভাবে চিহ্নিত না করে সঠিক পরামর্শ দেওয়া কঠিন। এ সময় কৃষক বলেন, 'হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিলে আমি ভিডিও কলের মাধ্যমে আমার পান ক্ষেতের সমস্যাগুলো আপনাকে দেখাতে পারি' এবং পরিশেষে ভিডিও কলের মাধ্যমে ওই সদস্যের পানের জমির সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিষয়টি আমাকে খুব অবাক করে এবং উপলব্ধি করি, একজন কৃষক শুধু একটি স্মার্টফোন ব্যবহার করে ডিজিটাল মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক অনেক তথ্য ও সেবা পেতে পারে। এতে কৃষক খুব সহজে তার ফসলের যেকোনো সমস্যার ছবি বা ভিডিও আপলোড করে সমস্যা সমাধানে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারে। এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেক ক্ষেত্রে ফসলের রোগবালাই এবং পুষ্টিজনিত ঘাটতির বাহ্যিক লক্ষণসমূহ প্রায়ই কাছাকাছি ধরনের হয়। এক্ষেত্রে সরেজমিন মাঠ পরিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো ভিডিও বা ছবি না দেখে মোবাইল ফোনে শুনে কোনো বালাইনাশক ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া উচিত নয় কারণ এতে সঠিক বালাইনাশক প্রয়োগ না করলে কৃষকের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ফসলেরও ক্ষতি হতে পারে এবং রোগ, পোকা-মাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা (Resistance power) বৃদ্ধি পায়।

আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল কৃষকের প্রয়োজনে আমরা বুরো কৃষি হটলাইন সেবার পাশাপাশি সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন অডিও-ভিডিও ক্লিপ, লিফলেট এবং কৃষি আবহাওয়া বার্তাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য প্রদান করা বা শেয়ার করা। একই সাথে এই গ্রুপের মাধ্যমে কৃষক নিজেও ছবি পাঠিয়ে বা অডিও-ভিডিও কলের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক যেকোনো সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেতে পারে– এই বিষয়টি তাদের অবহিত করা। পরবর্তীতে 'কৃষির সাথে কৃষকের পাশে' থিমকে সামনে রেখে মে ২০২২ সালে শুরু হয় বুরো কৃষিসেবার ডিজিটাল যাত্রা। কৃষিসেবার ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রাথমিক অবস্থায় সংস্থার যেসব সদস্য SMAP এবং সাধারণ কৃষিঋণ গ্রহণ করছেন এমন সদস্য নিজে বা পরিবারের কেউ স্মার্টফোন ব্যবহার করলে তাদের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সদস্য আগ্রহী হলে ঋণ গ্রহণের সময় বা পরবর্তী সময়ে

তাদের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টল করে সদস্যদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সংযুক্ত করা হয় এবং বর্তমানে এ কার্যক্রম সংস্থার ২৪টি অঞ্চলে একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিদ্যমান আছে। এ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে সহজেই বৃহৎ আকারে সদস্যদের কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এই যাত্রা শুরুর প্রথম চার মাসে মাত্র ৬৫০ জন কৃষককে এই গ্রুপে সংযুক্ত করা সম্ভব হয় যা মোটেও আশাব্যঞ্জক ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে সদস্যরা অনুধাবন করতে পারেন যে বুরো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রেরিত কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক অডিও-ভিডিও, কৃষি বার্তা লিফলেট ও সমস্যা সমাধানে প্রদানকৃত বিভিন্ন কৃষি পরামর্শগুলো তাদের কৃষি কার্যক্রমের জন্য যথেষ্ট সহায়ক এবং উপকারী। যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজারেরও অধিক কৃষক এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সংযুক্ত আছেন এবং প্রতি মাসে ঋণগ্রহীতা সদস্য ছাড়াও অনেক সাধারণ কৃষক এ কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছেন।

বুরো কৃষিসেবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রচুর কৃষক পরামর্শ চেয়ে প্রশ্ন করছেন। গ্রুপের মাধ্যমেই কৃষকের সমস্যার সমাধানে মেসেজের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, এতে সদস্যরা সহজে ঘরে বসে সমস্যার সমাধান পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন এবং সংস্থার প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়ছে।

মোটকথা, বুরো ডিজিটাল কৃষিসেবা পদ্ধতি কৃষকের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি ও অধিকতর উৎপাদন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে কৃষকের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করছে। কৃষকের নিকট সময়োপযোগী কৃষি তথ্য পৌঁছানোই বুরো কৃষিসেবার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে বুরো কৃষিসেবার আওতায় পরিচালিত একটি হটলাইনের মাধ্যমে দেশের যেকোনো স্থান থেকে সদস্যরা (০১৭০৯৯৮৪৬০৪) নাম্বারে ফোন করে কৃষি বিষয়ে পরামর্শ বা সমাধান নিতে পারছেন। সাপ্তাহিক ছুটি ও সরকারি বন্ধের দিন ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এ সেবাটি চালু থাকে।

পরিশেষে বুরো ডিজিটাল কৃষি কার্যক্রম বিষয়ে সেবা গ্রহণকারী প্রান্তিক কিছু কৃষকের মন্তব্য বা বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ লেখা শেষ করব যা আমাদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে একই সাথে এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের দায়িত্ববোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

● লেখক : সহকারী কর্মকর্তা, কৃষি
বুরো বাংলাদেশ

মো. মাহাবুর রহমান

গ্রাম: উত্তর ফেকা মারা
জালালপুর ইউনিয়ন
কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ

'বুরো কৃষিসেবায় যুক্ত থাকায় আমি সময়োপযোগী কৃষির বিভিন্ন তথ্য এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছি। কয়েক দিন আগে আমার আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা ও ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ হয়। প্রতিকারের জন্য আমি কীটনাশকের দোকানে যোগাযোগ করে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধ প্রয়োগ করি কিন্তু পোকা ও ব্লাষ্ট দমনে কাজ হয়নি।

সবশেষ বুরো কৃষিসেবায় যোগাযোগ করা হয় এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধানের জমিতে বেল্ট এক্সপার্ট+নাটিভো স্প্রে করি এবং সমস্যার সমাধান পেয়েছি। আমার এলাকায় এবং পাশের এলাকায় প্রায় ২০ জন কৃষককে আমি এই পরামর্শ দিয়েছি তারাও উপকৃত হয়েছে। আমি আশা করি, এই সেবা অব্যাহত থাকবে পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশকে কৃষকের পাশে থেকে সেবা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।

মো. আবু তাহের প্রামাণিক

গ্রাম: মালোহালী
মুরইল ইউনিয়ন
কাহালু, বগুড়া

'আমি বুরো বাংলাদেশ, বগুড়া কাহালু শাখার একজন সদস্য। আমি এই শাখা থেকে বেশ কয়েকবার কৃষিঋণ গ্রহণ করেছি এবং কৃষি বিষয়ে কিছু প্রশিক্ষণ পেয়েছি। আমি এক বছরের বেশি সময় আগে বুরো হোয়াটসঅ্যাপস গ্রুপের সাথে যুক্ত হই এবং এরপর থেকে নিয়মিতভাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ফসল চাষ, গবাদি পশুপালন এবং কৃষি যন্ত্রপাতি বিষয়ক সময় উপযোগী বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছি পাশাপাশি বিভিন্ন সময় প্রশ্ন করে উপযুক্ত পরামর্শ পেয়েছি। এসব তথ্য ও পরামর্শ আমার কৃষি কার্যক্রমে ব্যবহার করে আমি উপকৃত হয়েছি এবং কৃষি বিষয়ে অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমি আমার প্রতিবেশী ও পরিচিত আরও অনেক কৃষককে বুরো কৃষি সেবা-বগুড়া হোয়াটস অ্যাপস গ্রুপে যুক্ত হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছি এবং অনেকে এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন। এই ধরনের একটি ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমি বুরো বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানাই।'

মো. আমিনুর রহমান

গ্রাম: জানকিনাথপুর
লতিফপুর, মিঠাপুকুর
রংপুর

'আমি বুরো কৃষিসেবা হোয়াটসঅ্যাপস গ্রুপে যুক্ত হয়ে কৃষির বিভিন্ন তথ্য এবং সমস্যার সমাধান পাচ্ছি। বিশেষ করে কয়েক দিন আগে আমার ধানের জমিতে মাজরা পোকার আক্রমণ হয়েছে এবং বরবটিতে ভাইরাসজনিত রোগের কারণে আমার ফসলের খুব খারাপ অবস্থা হয়ে যায়। ওই সময় স্থানীয় কীটনাশক ডিলারের পরামর্শ অনুযায়ী ফসলে কিছু ওষুধ স্প্রে করেছিলাম কিন্তু তেমন কোনো উপকার পাইনি এবং আমার মনে হয়েছে আমি সঠিক ওষুধ ব্যবহার করিনি। তখন আমি বুরো হোয়াটসঅ্যাপস গ্রুপে ভিডিও ফোন করে পরামর্শ চাই এবং আমার ফসলের চিত্র দেখে তারা ধানের মাজরা পোকা এবং বরবটির ভাইরাস দমনের জন্য ফসলের জমিতে কিছু বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দুটি বালাইনাশক ব্যবহারের সুপারিশ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার ফসলের সমস্যার ভালো সমাধান করতে পেরে আমি খুব খুশি। এখন যেকোনো কৃষি কার্যক্রম শুরু করার আগে আমি এখান থেকে পরামর্শ নেই। প্রতিবেশী অনেক কৃষকও এখন এই গ্রুপে যুক্ত হয়েছেন।' ■

স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ

এস জেড এম সাহরিয়ার

এসডিজি লক্ষ্য ৬ এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সমূহে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য সার্বজনীন ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ ও সহজলভ্য খাবার পানি এবং পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থায় অভিগমন নিশ্চিতকরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মলত্যাগের স্থান পরিবর্তন করে খোলা জায়গার পরিবর্তে বসতবাড়ির একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ব্যবস্থা করতে পারলেও তা কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এখনও দেশের ৬১ শতাংশ মানুষের নিরাপদ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নেই এবং ৪১ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পায় না। এমতাবস্থায় নিরাপদ জীবনযাপনের জন্য বিষয়ভিত্তিক সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। বর্তমান সময়ে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে অফলাইন প্রশিক্ষণের পরিবর্তে অনলাইন প্রশিক্ষণের জনপ্রিয়তা বহুগুণে বেড়ে গেছে। বিষয়টি নজরে এনে বুরো বাংলাদেশ অত্যন্ত সহজলভ্য করে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করেছে।

অনলাইন কোর্সের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে শেখার মাধ্যম হিসেবে অনলাইন খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহারের ফলে শিখন অনেকটাই সহজ এবং ব্যয়সাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। একটা সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে মলাটে মোড়ানো বই ছাড়া জ্ঞান অর্জনের পথ খুব বেশি প্রশস্ত ছিল না। বুরো বাংলাদেশ অনেক আগে থেকেই প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রতি তার কর্মীদের উৎসাহ প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করছে। ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের সংস্পর্শে আসার মূল কারণ সময় সাপেক্ষতা ও সহজলভ্যতা। একটি অফলাইন কোর্স সম্পন্ন করার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলে বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে বিশেষ করে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি নিয়ে কর্মরত কর্মীরা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়গুলো সুচারুভাবে মনে রাখতে পারেন না, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ের একজন

> অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থাকার কারণে মাঠ পর্যায়ের একজন প্রশিক্ষক খুব সহজেই সেখান থেকে সাহায্য নিয়ে নিজের জ্ঞানকে প্রসারিত করার সুযোগ রয়েছে। ফলে কর্মীরা তাদের বিদ্যমান দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারেন।

প্রশিক্ষক সহজেই সেখান থেকে সাহায্য নিয়ে নিজের জ্ঞানকে প্রসারিত করার সুযোগ রয়েছে। ফলে কর্মীরা তাদের বিদ্যমান দায়িত্ব এবং প্রতিশ্রুতিগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে পারেন। আবার যেসব কর্মী অফলাইন কোর্স সম্পন্ন করতে পারেন না তাদেরও অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটি পর্যায়ে বর্তমানে অনেক মানুষই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট ব্যবহার করার কারণে তারাও সহজে নিজের মতো করে সময় বের করে, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য তেমন কোনো উপকরণ লাগে না এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ বহনও করতে হয় না, ফলে সহজভাবেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। কোনো বিষয়ে বুঝতে সমস্যা হলে যেকোনো জায়গায় বসে তা সম্পর্কে জানার সুযোগ রয়েছে। বাজারে অলস সময় কাটানো কিংবা বাড়িতে অবসর সময়ে বসে থাকা মানুষগুলোকেও সহজে এ কোর্সের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

অসুবিধা

অনলাইন প্রশিক্ষণে মুখোমুখি কথা বলার সুযোগ না থাকার কারণে মনের ভেতরে জেগে ওঠা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। একটু বেশি সময় ধরে দেখতে থাকলে একঘেয়েমি চলে আসে। অনেক সময় জায়গাভেদে নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকার কারণেও শেখার সুযোগ থাকে না। পরিশেষে বলা যায়, কর্মজীবনে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রশিক্ষণ একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম যা মানবসম্পদ উন্নয়নে এক বিশেষ এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান কতটা শক্তিশালী সেটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ জনবলের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করা মোটেও অপচয় নয় বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। বুরো বাংলাদেশে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণকে সহজভাবে উপস্থাপন করার ফলে সহজেই মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও গণমানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন পরিচালনা সহজতর হচ্ছে।

● প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ওয়াশ, বুরো বাংলাদেশ

(https://sites.google.com/view/burowashonlinecourse/home)

স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন কোর্স সম্পর্কে অভিমত

রাহাত ইকবাল
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক
মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, টাঙ্গাইল

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ নামে অনলাইন প্রশিক্ষণটি বুরো বাংলাদেশের কর্মী এবং প্রশিক্ষক সবার জন্যই শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থানে সহায়ক হিসেবে সেশন পরিচালনার সুযোগ পেয়েছি। সরাসরি প্রশিক্ষণ অনেক ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ। যেহেতু আমাদের সব জায়গায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে যে কেউ যেকোনো সময় উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। তাছাড়া প্রশিক্ষণটি ১৯টি সেশনে ভাগ করার কারণে যখন ইচ্ছে তখনই এমনকি ছুটির দিনেও বাসায় বসে স্বল্প সময় হাতে নিয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকছে। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণটি বুরো বাংলাদেশের সব পর্যায়ের কর্মীদের শেখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিবলু মিয়া
উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক-ওয়াশ
বুরো বাংলাদেশ

অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো বর্তমান সময়ে প্রশিক্ষণের জন্য খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এর অন্যতম কারণ হলো, প্রায় সব মানুষের হাতে আধুনিক মুঠোফোন থাকার কারণে সহজলভ্যভাবেই বেশিরভাগ মানুষের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো পৌঁছে দেওয়া যায়। বুরো বাংলাদেশ গণমানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে পানিবাহিত রোগের আক্রমণের হার কমানোর উদ্দেশ্যে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের ওয়াশ বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে এবং সদস্য পর্যায়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সহজ হয়েছে। একজন ওয়াশ প্রশিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি প্রশিক্ষণের জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করা মোটেও অপচয় নয় বরং এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বুরো বাংলাদেশ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণকে সহজভাবে উপস্থাপন করার ফলে সহজেই মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষক ও গণমানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্বির মাধ্যমে সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপন পরিচালনা সহজতর হচ্ছে।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম
প্রশিক্ষক-ওয়াশ
বুরো বাংলাদেশ

একজন প্রশিক্ষক হিসেবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলাম যে, কোনো ধরনের উন্নয়নমূলক কার্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হলে দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়া তা সম্ভব নয়। তারই ধারাবাহিকতায় বুরো বাংলাদেশের সদস্য ও কর্মীদের ওয়াশবিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নে সরাসরি/পাশাপাশি অনলাইনে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স গ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। ওয়াশ প্রশিক্ষণ চলাকালীন কোনো প্রশিক্ষণার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে বা অনিবার্য কারণে প্রশিক্ষণ কোর্সটি শেষ করতে না পারলে অনলাইন পোর্টালটি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থী কোর্সটি সম্পন্ন করতে পারবেন। অনলাইন পোর্টালটি বুরো বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে ওয়াশ কার্যক্রম বাস্তবায়নে অনেক সহজ করেছে। এ কোর্সের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অবসর সময়ে মোবাইলের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান লাভ করা যায়। একবার দেখে কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে তা বারবার দেখে বোঝার সুযোগ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সাথে আলোচনা করতে সহায়ক হিসেবেও কাজ করে। Online Basic WASH Training Course সাথে থাকলে নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ে প্রশিক্ষক কোনো তথ্য/বার্তা ভুলে গেলে সাথে সাথে তা দেখে নেওয়া যায়। সে জন্য আমি প্রশিক্ষণ কোর্সটিকে অত্যন্ত যুগোপযোগী বলে মনে করি।

মোঃ শরীফ হাসান চৌধুরী
প্রশিক্ষক–ওয়াশ
চট্টগ্রাম বিভাগ, বুরো বাংলাদেশ

প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে শতভাগ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলার সহজ ও আনন্দদায়ক মাধ্যম হিসাবে অনলাইন মৌলিক প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যে সারা ফেলেছে। অনলাইন কোর্সটিতে ১৯টি সেশনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধা অনুযায়ী প্রতিটি সেশনে শিখন-উদ্দেশ্য এবং বিষয় লেখা আছে, যার ফলে খুব সহজেই অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশিক্ষণটি বোধগম্য হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, নিরাপদ পানি পান, পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি কীভাবে ছড়ায় এবং স্বাস্থ্য অভ্যাস মেনে চললে সুস্থ ও রোগমুক্তভাবে জীবনযাপন করতে পারে তা জানতে পারছে। সংস্থার কর্মীরা দারিদ্র্য উন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্যানিটেশন ও ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্যক্রমের ভূমিকা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে। আরও জানতে পারছে স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কিত জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল পানি ও পয়োনিষ্কাশন স্থাপনা তৈরির কৌশল। এর ফলে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণটি খুব সহজে কেন্দ্রে বা সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শন করার কারণে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বুরো বাংলাদেশের বড় উদ্যোগ। নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণে খুব সহজে অংশগ্রহণ করে এ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণগত ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক অনলাইন কোর্স সম্পর্কে অভিমত

সোমা দাস
ডেপুটি ম্যানেজার-ট্রেইনিং
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), সিরাজগঞ্জ

আমাকে পেশাগত প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মীসহ সদস্য পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হয়। বুরো বাংলাদেশ এর ওয়াশ কর্মসূচির আওতায় তিন দিনের ওয়াশ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম অনলাইন প্রশিক্ষণ পোর্টালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাথে থাকা মোবাইল ফোনটির মাধ্যমেও অল্প সময়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আহরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীরাও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই ওয়াশ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন ও পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে প্রয়োগ করে সুস্থ, সুন্দর ও নিরোগ জীবনযাপন করতে পারে।

মো. সুজন
সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক
পথেরহাট শাখা
চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল

ওয়াশ অনলাইন প্রশিক্ষণটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রশিক্ষণটির প্রতিটি বিষয়বস্তু অত্যন্ত সাবলীল ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার ফলে একদিকে যেমন আমি নিজে উপকৃত হয়েছি তেমনি আমার কর্ম এলাকার সাধারণ মানুষ ও সদস্যদের মাঝে ওয়াশ সম্পর্কে ধারণা দিতে সহজ হয়েছে। পাশাপাশি শাখার সব সহকর্মীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতন ও এ সম্পর্কে ধারণা অর্জন সম্ভব হয়েছে। অনলাইন ওয়াশ প্রশিক্ষণের ফলে স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন ও ব্যবহার, নিরাপদ পানি পান করা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সহজে যেকোনো সময় ওয়াশ অনলাইন প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে যা সময়োপযোগী।

মোঃ মিঠুন হোসেন
ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক
গালা শাখা, টাঙ্গাইল অঞ্চল

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বুরো বাংলাদেশের ওয়াশ বিষয়ক অনলাইন পোর্টালটি নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক একটি তথ্যনির্ভর পোর্টাল। এই পোর্টালটির মাধ্যমে আমি যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে প্রশিক্ষণটি দেখতে ও শুনতে পাই। তাতে করে আমি সহজেই ওয়াশ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। যার ফলে সংস্থার সদস্যদের মাঝে পানি ও পয়োনিষ্কাশন ঋণ বিতরণ এবং ওয়াশ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রদানের সময় তাদের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ে সচেতন করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল হয়েছে। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে আমি মনে করি এই অনলাইন পোর্টালটির মাধ্যমে সব শ্রেণি পেশার মানুষকে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ে সচেতন করাসহ এসডিজির ৩ ও ৬ নম্বর লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব।

শামছুন্নাহার
পরিবেশ কর্মকর্তা
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, নোয়াখালী

দীর্ঘদিন ওয়াশ কর্মসূচিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের ওয়াশ কর্মসূচির আওতায় তিন দিনের ওয়াশ বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু করেছি। বুরো বাংলাদেশ কর্তৃক নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। বুরো বাংলাদেশের অনলাইন পোর্টালটি মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নে অনেক সহজ হয়েছে। এ কোর্সের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো অফিস টাইম ছাড়াও আমরা আমাদের সুবিধামতো সময়ে বিষয়গুলো জানতে পারি। অফিস বন্ধের দিনও আমরা সেশনগুলো পড়তে ও বুঝতে পারি। একবার পড়ে কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে পুনরায় দেখে বোঝার সুযোগ রয়েছে।
এটি এমন একটা কোর্স যা সবসময় সাথে রাখা যায় কেননা মোবাইল ফোন সবসময় হাতেই থাকে। মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের সাথে আলোচনা সহায়ক হিসেবে কাজ করে।
নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণের Online Basic Training Course সাথে থাকলে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ে যেকোনো তথ্য/বার্তা ভুলে গেলে সাথে সাথে দেখে নেওয়া যায়। এটা সময়োপযোগী একটি প্ল্যাটফর্ম বলে আমি মনে করি।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমে ডিজিটাইজেশন

আসাদুজ্জামান মুকুল

মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম হলো স্বাস্থ্যের অধিকার। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নয়নের ওপর। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের স্বাস্থ্য অবস্থার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে মাথাপিছু স্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয় সবচেয়ে কম, মাত্র ৪৫ ডলার বা ৫,০০০ টাকা। অন্যদিকে আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কায় মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় ১৫৭ ডলার বা প্রায় ১৮,০০০ টাকা। আমাদের দেশের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মাত্র ৫ শতাংশের মতো বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে স্বাস্থ্য খাতে। স্বাস্থ্য খাতে এ রকম নিম্ন বরাদ্দ দিয়ে বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা দুরুহ। এ জন্য ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের অনেকের পক্ষে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। ফলশ্রুতিতে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ অনেকটা ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বুরো বাংলাদেশ তার সূচনালগ্ন থেকে সর্বদা দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে আসছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় কৃষি, শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও পয়োনিষ্কাশন, আর্থিক স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্যসহ নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় Opportunity International Australia এবং Australian Aid এর সহযোগিতায় ২০১৯ সালে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে Opportunity পরিবারের Opportunity International Germany, Opportunity International Switzerland এবং ZF-hilft Foundation বুরো বাংলাদেশের সাথে মৌলিক স্বাস্থ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসে। বর্তমানে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে ২ লক্ষ ৭০ হাজার পরিবারে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে এবং ইতিমধ্যে ৫ লক্ষ ১৪ হাজার পরিবারকে মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার জনকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

> বুরো বাংলাদেশ তার সূচনালগ্ন থেকে সর্বদা দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর টেকসই উন্নয়নে নিরলস ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে আসছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বুরো বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক পরিবারে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রদান করে থাকে এবং এ কাজটি মূলত করে থাকেন কমিউনিটি থেকে মনোনীত নারী কো-হেলথ এডুকেটররা। কো-হেলথ এডুকেটরদের জন্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন করা হলেও লক্ষিত জনগোষ্ঠীর পরিবারকে প্রদান করার মতো কোনো শিখন সহায়ক উপকরণ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ প্রতি বছর ৩ লক্ষ পরিবারের জন্য উপকরণ মুদ্রণ করা অনেক ব্যয়বহুল। এ জন্য যেসব পরিবারে স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছিল তারা পরবর্তী সময় নিজেদের মতো করে শিখন বিষয়গুলো চর্চা করতে পারত না এবং যথাযথভাবে পরিবারের সদস্যসহ অন্যান্যদের সাথে শেয়ার করতে পারত না। ফলশ্রুতিতে শিখন বিষয়গুলো দীর্ঘদিন মনে রাখাও তাদের জন্য কষ্টকর হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে কো-হেলথ এডুকেটররা যেসব পরিবারের স্মার্টফোন ছিল তাদের প্রতিটি সেশনের বিষয়বস্তুর ছবি তুলে দিয়ে আসত যাতে পরবর্তীতে তারা বিষয়গুলো নিজেদের মতো করে চর্চা করতে পারেন। এতে দেখা যায় অনেকেই আগ্রহী হচ্ছেন এবং বিষয়গুলো মনে রাখতে পারছেন। তখন আমাদের মাথায় আসে কীভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো ডিজিটালাইজ ও আরও ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা যায়। সেই ভাবনা থেকেই বুরো বাংলাদেশ ২৬ সপ্তাহের স্বাস্থ্যশিক্ষার পুরো কারিকুলামকে ছবি, টেক্সট, অডিও এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভিডিওর সমন্বয়ে অনলাইন এবং অফলাইন সুবিধা সংবলিত 'স্বাস্থ্যশিক্ষা বার্তা' নামীয় একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস তৈরি করে এবং এটি সবাই যেন বাধাহীনভাবে ব্যবহার করতে পারেন ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেন সুফল ভোগ করতে পারেন সে জন্য সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যে কেউ গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে এটি মোবাইল ফোনে ব্যবহার করতে পারবেন। অ্যাপসটিতে স্বাস্থ্যশিক্ষার ১১টি মূল বিষয়ের ৫২টি উপবিষয় ২৬টি সেশনে ধারাবাহিকভাবে সুন্দরভাবে সাজানো আছে এবং প্রতিটি সেশনে অনেক বিষয়ভিত্তিক ভিডিও সংযোজন করা হয়েছে যাতে সবাই সহজে প্রতিটি বিষয় আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ফলে লক্ষিত জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো যেকোনো সময় এর বিষয়বস্তুসমূহ চর্চা করতে পারছেন এবং নিজেদের নিকটজন ও প্রতিবেশীদের সাথে শেয়ার করতে

পারছেন। অ্যাপসটি অফলাইন সাপোর্টেট হওয়ায় শুধু প্রথমবার ব্যবহারে ইন্টারনেট প্রয়োজন হয়। পরবর্তীতে যতবার খুশি ততবার ব্যবহার করতে পারছেন কোনো ইন্টারনেট সুবিধা ছাড়াই। এই ডিজিটাল অ্যাপসটিতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, নবজাতকের যত্ন, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ সম্পর্কিত তথ্যের পাশাপাশি কিশোরীর স্বাস্থ্য ও ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, ছবি ও ভিডিও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কিশোরীরা নিঃসঙ্কোচে অ্যাপস থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা গ্রহণ করতে পারছেন যা প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে এবং সমাজে প্রচলিত মিথ, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে।

বুরো বাংলাদেশ স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বর্তমানে ১৩টি জেলার ৫৭টি উপজেলায় ১ জন এমবিবিএস ডাক্তারের নেতৃত্বে ৫৮ জন রেজিস্টার্ড মেডিকেল অ্যাসিসটেন্টের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষিত ও বৃহত্তর কমিউনিটির অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর ৩ লক্ষাধিক পরিবারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দান কার্যক্রমটিকেও ডিজিটাইজেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রতিটি স্বাস্থ্যসেবাদান রেকর্ড রাখার জন্য 'হেলথ ইনফো' নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। মেডিকেল অ্যাসিসটেন্টরা যাতে অ্যাপসটি ব্যবহার করে সব রোগীর সেবাদান তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন সে জন্য ৫৮ জন মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট সবাইকে উন্নতমানের ট্যাবলেট ফোন দেওয়া হয়েছে এবং সব তথ্য যেন সুরক্ষিত থাকে এবং সবার তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত হয় সে জন্য প্রধান কার্যালয়ে একটি সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে এটির রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দানের পাশাপাশি সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ীমূল্যে রোগনির্ণয় ও টেলিমেডিসিন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বুরো বাংলাদেশ টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতী, ঘাটাইল ও মধুপুর উপজেলার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকায় ছয়টি 'বুরো কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টার' স্থাপন করেছে। সেন্টারগুলোতে গ্রামীণ, দরিদ্র, অনগ্রসর ও উপজাতি জনগোষ্ঠীর সদস্যগণ মাত্র ১০০ টাকার রেজিস্ট্রেশন ফি-এর মাধ্যমে সারা বছর পরিবারের ৪ জন সদস্য যতবার প্রয়োজন ততবার এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ, টেলিমেডিসিন সেবা এবং ১১টি রোগ নির্ণয়সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির আগ্রহী যে কেউ সাশ্রয়ী ও হ্রাসকৃত মূল্যে ২৯টি রোগ নির্ণয়সেবা ও ডাক্তারের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। সেন্টারসমূহের আগত রোগীদের রেজিস্ট্রেশন, সেবাদান তথ্য, টেলিমেডিসিন সেবা, ই-প্রেসক্রিপশন, রোগনির্ণয় সেবাদান ইত্যাদি সব কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক প্রকল্পের বেইজলাইন, মিডলাইন এবং অ্যান্ডলাইন জরিপ, সাপ্তাহিক ও মাসিক বিভিন্ন প্রকার অগ্রগতি প্রতিবেদন, বাড়ি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, কেইস স্টোরি তৈরিসহ অধিকাংশ ডকুমেন্টেশন পেপারলেস করা হয়েছে। অর্থাৎ জরিপের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার, প্রতিবেদনের জন্য গুগল ফর্ম ও গুগল শিট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য প্রাসঙ্গিক ভিডিও এবং ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন সহায়ক প্রশিক্ষণ উপকরণ উন্নয়ন করা হচ্ছে। যাতে অংশগ্রহণকারীগণ অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া সহজে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু শিখতে পারেন।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দান কার্যক্রম ডিজিটাইজেশনের ফলে স্বল্প খরচে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্ভব হচ্ছে। প্রিন্ট উপকরণ ও কাগজের ব্যবহারের পরিবর্তে ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করার ফলে এটি যেমন অনেক টাকা ও সম্পদের অপচয় হ্রাস করছে তেমনি পরিবেশ ও জলবায়ুর উন্নয়নেও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। তাছাড়া একটা সময় পর এ ধরনের প্রকল্প সময়সীমা শেষ হয়ে গেলেও ডিজিটাল মাধ্যম থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সেবা ও উপকৃত হওয়ার সুযোগ অব্যাহত থাকবে। আশা করছি বুরোর স্বাস্থ্যশিক্ষা বার্তা অ্যাপসসহ অন্যান্য ডিজিটাইজেশন উদ্যোগসমূহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ■

● প্রকল্প ব্যবস্থাপক
মৌলিক স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি, বুরো বাংলাদেশ

ক্যাশলেস লেনদেনে নির্ঝঞ্ঝাট সেবা

চলনবিলের মানুষের জীবন সংগ্রাম একেক মৌসুমে একেক রকম হয়। বর্ষার ভরা মৌসুমে ৪-৫ মাস বিলের পানি দখল করে নেয় প্রান্তরের পর প্রান্তর, পাওয়া যায় অগুনতি মাছ। চারদিকে পানি বেষ্টিত একেকটি গ্রামকে এ সময় মনে হয় ছোট একটা দ্বীপ। যাতায়াতের একমাত্র বাহন তখন নৌকা। আর শুকনো মৌসুমে পানি শুকিয়ে গেলে চলনবিলের বুকজুড়ে চাষ হয় ধান, ভুট্টাসহ নানারকম চৈতালী ফসল।

দেশের সবচেয়ে বড় এই বিলের এক অংশে সিরাজগঞ্জের ধরইলে বাস করেন মোঃ ওমর ফারুক। ২৮ বছর বয়সি ওমর ফারুক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। শিক্ষানবিশ আইনজীবী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি তিনি তার বাবার ব্যবসায় সহায়তা করে থাকেন। পরিবারে রয়েছে বাবা-মা ও এক বোন।

২০২২ সালের প্রথম ভাগে বুরো বাংলাদেশ থেকে ঋণ নিয়ে তাদের মুদির দোকানটি বড় করে ব্যবসার পরিসর বাড়ানোর চিন্তাভাবনা থেকে বুরো বাংলাদেশের ধরইল শাখার সদস্য হন ওমর ফারুক। ঋণের প্রথম কয়েকটি কিস্তি তিনি নিয়মিত শাখায় এসে পরিশোধ করেন। কিন্তু বর্ষা মৌসুম শুরু হলে শাখায় এসে কিস্তির টাকা দিয়ে যাওয়া একটি দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে। এ সময় চলনবিলে পানি বেড়ে যাওয়ায় ওমর ফারুকের বাড়ির চারপাশ পানিতে থৈ থৈ করে। বাতাসের তীব্র গতিবেগ আর পানির স্রোতে নৌকায় করে বিল পাড়ি দেওয়া এ সময়টাই ঝুঁকিরও বটে। এ অবস্থায় যোগাযোগ সমস্যার কারণে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে মুশকিলে পরে যান ওমর ফারুক।

ওমর ফারুকের দোকানে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের পাশাপাশি এলাকার মানুষদের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা রয়েছে। শিক্ষিত এই যুবক ব্যক্তিগত কাজের প্রয়োজনেও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে অভ্যস্ত। আর তাই বুরো বাংলাদেশের সদস্যরা ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারেন জেনে তিনি আনন্দিত হন।

তিনি বলেন, 'বুরোর কিস্তি মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ করার সুযোগ থাকায় বুরোর আর্থিক সেবা নেওয়াটা আমার জন্য অনেক সুবিধার হয়েছে। আমাদের এখানে বন্যা থাকে ৪-৫ মাস। তখন আবহাওয়া ও যাতায়াতের সমস্যার কারণে কিস্তি দিতে অসুবিধা হয়। আর তাই আমি যখন থেকে জানতে পেরেছি, তখন থেকে ডিজিটালি

কিস্তির টাকা পরিশোধ করছি। আমি দোকানে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের কাজ করি, আর এ জন্য আমার মোবাইলে টাকা থাকার কারণে যখন সময় পাই, টাকা পাঠিয়ে দিই।'

মোবাইলের মাধ্যমে দোকানে বসে কিস্তি পরিশোধ করার ফলে দোকানের কাজে আগের চেয়ে মনোযোগ দিয়ে করতে পারছেন ওমর ফারুক। ফলে তার ব্যবসায়ের অবস্থা দিন দিন উন্নতির মুখ দেখছে। অন্যদিকে বাজারে দোকান থাকার কারণে অনেক গ্রাহক মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবহার করে তার মোবাইলে যে টাকা পাঠান, সেই টাকা ক্যাশ-আউট না করে সরাসরি তার ঋণ/সঞ্চয় হিসাবে পাঠিয়ে দিতে পারছেন।

বুরো বাংলাদেশ তার যাত্রার শুরু থেকে সদস্যদের জন্য সময়োপযোগী ও চাহিদানির্ভর আর্থিক সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে আর্থিক সেবা প্রদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস নামক কর্মসূচি সদস্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বুরো বাংলাদেশ। আর এই কর্মসূচির সুবাদে চলনবিলের বাসিন্দা, বুরোর সদস্য ওমর ফারুক আজ কিস্তির টাকা মোবাইলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারছেন ঘরে বসে কিংবা যেকোনো জায়গা থেকে, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে। ■

মনীষা সেতু হাজং
● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

> ওমর ফারুকের দোকানে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের পাশাপাশি এলাকার মানুষদের জন্য মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা রয়েছে। এই যুবক ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে অভ্যস্ত। তাই বুরো বাংলাদেশের সদস্যরা ডিজিটাল আর্থিক পরিষেবা গ্রহণ করে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারেন জেনে তিনি আনন্দিত হন।

শফিকুল ইসলাম
শাখা হিসাবরক্ষক, মুন্ডুমালা শাখা
রাজশাহী অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন হওয়াতে কাজের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে অধিক কাজ করা যায়। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা সম্ভব হচ্ছে। হিসাবের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সদস্যদের দ্রুত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে যেমন-কম্পিউটার, স্মার্টফোন, ট্যাব ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে আমার কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। এই পরিবর্তনকে আমি সাধুবাদ জানাই। বর্তমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে টেকনোলজির ব্যবহার ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়, বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের ডিজিটালাইজেশন হওয়াতে বর্তমান টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে সদস্য ও প্রতিষ্ঠান উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। দ্রুত সময়ে তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক আরও জোরদার হচ্ছে।

কাইয়ুম চৌধুরী
ঊর্ধ্বতন কর্মসূচি সংগঠক, সরারচর শাখা
ময়মনসিংহ অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের ডিজিটাইজেশন হওয়াতে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, ঝুঁকি কমেছে, যেকোনো কাজে সময় কম লাগে, যার ফলে অধিক সদস্যদের নিয়ে কাজ করা যায় এবং মাঠে অনেক সময় দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে আমার কাজের দক্ষতা/ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময়ে আইসিটি বিভাগ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছি।

তাহমিনা আক্তার
কর্মসূচি সংগঠক, উত্তরা শাখা
ঢাকা উত্তর অঞ্চল

সংস্থার ডিজিটালাইজেশন ও ডিজিটাল লেনদেন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে কর্মী হিসেবে আমরা এবং আমাদের সম্মানিত সদস্যরা অভাবনীয় সুবিধা পেয়েছি। ডিএফএসের কারণে এখন আমাদের আর নগদ টাকা লেনদেন করতে হয় না। ফলে ঝুঁকি কমেছে, নিরাপত্তা বেড়েছে। মাঠকর্মীদের আলাদাভাবে কালেকশন তথ্য পোস্টিং করতে হচ্ছে না। ঋণ বা সঞ্চয়ের কিস্তি আদায় করার সময়ই আমাদের সিস্টেমে তথ্য রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন মোবাইল সার্ভিসের মাধ্যমে সদস্যরা নিজেরাই টাকা জমা করতে পারায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমাদের সময় ব্যয় করতে হয় না এবং তাদেরে কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদের জন্য আলাদা সময় বের করতে হয় না। তাছাড়া সদস্যরা টাকা প্রেরণ করার সাথে সাথে তার নিশ্চয়তা বার্তা পেয়ে যান এবং যেকোনো সময় তার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক করতে পারে বলে আমাদের ও সংস্থার প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।

আরেকটি বড় সুবিধা হলো, ঋণ ও কিস্তির টাকা এখন আর আলাদাভাবে পোস্টিং দিতে হয় না। সদস্যের জমা দেওয়া টাকা থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঋণ, মেয়াদি সঞ্চয় ও সাধারণ সঞ্চয়ে নির্ধারিত অংকের টাকা পৃথক পৃথকভাবে জমা হয়ে যায়। অর্থাৎ একত্রে টাকা জমা দিলেই তা সঠিক অংকে ভাগ হয়ে তার নির্দিষ্ট খাতে জমা হয়। তবে মোবাইল ফোনে লেনদেন করার ক্ষেত্রে অপশন আরও কমিয়ে আনতে পারলে সদস্যদের উপকার হবে বলে মনে করি। কারণ অনেক সদস্য মোবাইলে অনেক অপশন অতিক্রম করে টাকা জমা দিতে অসুবিধা বোধ করেন।

আদম আলী

শাখা ব্যবস্থাপক, ঠাকুরগাঁও উত্তর শাখা, ঠাকুরগাঁও অঞ্চল

বিগত চার বছর সংস্থায় কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। সঠিক পরামর্শ এবং সহজ শর্তে ঋণ সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অনেক সদস্যদের জীবন বদলের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সঠিক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন অনেককে ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হতে দেখেছি ঠিক তেমনি মহাজনি ঋণ প্রথা থেকে মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে দেখেছি অনেককেই। অনেক নারী সদস্যকে ক্ষুদ্র লোন গ্রহণ করে গবাদিপশু লালন-পালন করে পরিবারের বোঝার পরিবর্তে পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ মানুষে পরিণত হতে দেখেছি। টেকসই উন্নতির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যমে সামাজিকভাবে অনেকেরই জীবনযাত্রার মান বদলে যেতে দেখেছি।

বুরো বাংলাদেশের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে সংস্থার সব কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা। যার মাধ্যমে সংস্থার কর্মরত সব সহকর্মীরা এখন তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম সহজে সম্পাদন করতে পারছেন। লাইভ কালেকশন, ডিএফএসের মাধ্যমে সঞ্চয় ও লোনের কিস্তি কালেকশন যেমন আমাদের সময় ও শ্রম বাঁচাচ্ছে ঠিক তেমনি আগের মতো কাগজে লেখা ও রাত জেগে কাজ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দিয়েছে। সহকর্মীদের মাঝে ট্যাব-ল্যাপটপ বিতরণের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে এখন সহজে সবার সঙ্গে যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস করে। সদস্যদের প্রয়োজনীয় বিষয় পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি কৃষি, চাষাবাদ, গবাদিপশু পালন, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সহজ শর্তে আর্থিক লোন সহযোগিতার পাশাপাশি শিক্ষা বৃত্তি প্রদান, রেমিট্যান্স প্রদান, নিরাপদ নলকূপ ও ল্যাট্রিন স্থাপন প্রভৃতি খাতে লোন প্রদানের মাধ্যমে সদস্যদের বিভিন্ন উপকার করে থাকে। এছাড়াও মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রকল্প, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে লেনদেনের সুযোগ প্রদান করে নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করে। আমার আগের কর্মস্থলে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি প্রবাসী পরিবারের সদস্যদের নামে পাঠানো রেমিট্যান্স ওঠানোর জন্য সুবিধাভোগীদের ব্যাংকে দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে। সেখানে বুরো বাংলাদেশ শাখা কার্যালয় থেকে দ্রুত সময়ে টাকা হাতে পেয়ে তারা আনন্দিত। জীবন চলার পথে অভিজ্ঞতা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। বুরো বাংলাদেশে কাজ করতে এসে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া, মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলার শিক্ষা, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি আমার বাস্তব জীবনে আমাকে এখন পথচলার পথে সাহস যোগায়। প্রতিকূল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় তার শিক্ষা আজ আমাকে জীবন চলার পথে অনুপ্রেরণা যোগায়।

আবদুল মতিন

শাখা ব্যবস্থাপক, সৈকত শাখা, কক্সবাজার অঞ্চল

সদস্যের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নতির জন্য আর্থিক সামর্থ্য সৃষ্টি করে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করে এবং নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পাশাপাশি চাহিদা মাফিক মূলধন যোগান দিয়ে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করি, গুণগত মানসম্পূর্ণ আর্থিক সেবা ও সুপরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে তারা সাবলম্বী হয়। বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম অবশ্যই একটি পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের কাজ আরও গতিশীল হয়েছে। এটি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা ওয়েব ক্যামেরার সাহায্যে সদস্যদের এর আইডি কার্ড ও ছবি স্ক্যান করে দ্রুত সংরক্ষণ করতে পারি। সদস্য ঘরে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তার সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তির প্রদান করতে পারে। সদস্যের সক্ষমতা বিবেচনা করে চাহিদা মাফিক অল্প কিছু সঞ্চয় নিয়ে আমরা ঋণ প্রদান করে থাকি।

সিরাজুল ইসলাম

শাখা হিসাবরক্ষক, সাহেবের হাট শাখা, নোয়াখালী অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের ডিজিটাইজেশন হওয়াতে আপনার কাজের প্রক্রিয়ায় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে? এই পরিবর্তনকে আপনি কীভাবে দেখেন? এক্ষেত্রে আপনার কাজের দক্ষতা/সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংস্থা থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে কি?

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রমের ডিজিটাইজেশন হওয়াতে আমার কাজে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে যেমন কাজে সময় কম লাগে, বিভিন্ন রেজিস্ট্রারে ম্যানুয়ালি পোস্টিং দেওয়া লাগে না, রিপোর্ট মেলাতে অনেক বিড়ম্বনার স্বীকার হতে হতো। এখন রিপোর্ট মেলাতে কোনো ধরনের ঝামেলা পেতে হচ্ছে না, দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করা যায়, ডিএফএস লেনদেনের ফলে নগদ টাকার ঝুঁকি কমেছে, কালেকশন আদায় ও জমার কাজ অনেক সহজতর হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে আমাদের ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে আইটি বিভাগের মাধ্যমে আমাদের কাজের মান উন্নয়নে বিভিন্ন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। বুরোর ঋণ ও সঞ্চয় সেবার মান সদস্যদের চাহিদামুখী ও সহজ হওয়ায় বুরোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হতে বুরো বাংলাদেশ বড় ভূমিকা পালন করে। আমার দেখা অসংখ্য সদস্য রয়েছে যারা আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

উজ্জ্বল হোসেন

এলাকা ব্যবস্থাপক, ঠাকুরগাঁও এলাকা
ঠাকুরগাঁও অঞ্চল

ডিজিটালাইজেশনের ফলে সময় সেভ হওয়াতে আমি মাঠ পর্যায়ে বেশি পরিমাণ সদস্যদের সময় দিতে পারছি। যেমন– কেন্দ্র পরিদর্শন, কর্মএলাকা জরিপ, ঋণ প্রস্তাব সরেজমিন পরীক্ষা, খেলাপি যোগাযোগ, ঋণ তদারকি, ঋণ পুনঃপরীক্ষা ইত্যাদি।
প্রতিদিনের সব শাখার সব ধরনের স্বচ্ছ রিপোর্ট দেখে ফলোআপ ও মনিটরিং জোরদার করার সুযোগ হয়েছে। প্রতিদিনের সাপ্তাহিক, মাসিক রিপোর্ট না দেওয়াতে অনেক সময় সেভ হচ্ছে এবং সেই অতিরিক্ত সময় পরিকল্পনা করে কর্মসূচি বেগবান করার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। এক শাখায় বসে অন্য শাখার সব তথ্য দেখে পদক্ষেপ নিতে পারি।

আশরাফ উজ্জামান

এলাকা ব্যবস্থাপক, সীতাকুণ্ড এলাকা
চট্টগ্রাম উত্তর অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশের কাজের ডিজিটাইজেশন হওয়াতে কাজের প্রক্রিয়া অনেক উন্নতি হয়েছে, যেকোনো কাজ দ্রুত করা যায়, হাতে রিপোর্ট করতে হয় না, সবসময় মনিটরিং করা যায়। কোনো রিপোর্ট করতে গিয়ে শাখা ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে কোনো তথ্য নিতে হয় না। বর্তমানে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। এ পরিবর্তন আমার কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে দিয়েছে যা আমার কাছে ভালো লেগেছে। এ ধরনের দক্ষতা বা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থা বিভিন্ন সময় আইসিটির ওপর ওরিয়েন্টশন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আইসিটির ওপর মকটেস্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

মোস্তাফিজার রহমান

এলাকা ব্যবস্থাপক, নেত্রকোনা এলাকা
ময়মনসিংহ অঞ্চল

বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় আমার কাজের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিটি দেশ যেমন ডিজিটালাইজেশনের দিকে ধাবিত হচ্ছে বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে দেশের ডিজিটালাইজেশন। ব্যবস্থা ঠিক তেমনি এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় ডিজিটালাইজেশন ব্যবস্থার যে পরিবর্তন এনেছে বুরো বাংলাদেশ তার ব্যতিক্রম নয়। আমি মনে করি দেশের এমএফআই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডিজিটালাইজেশন পদ্ধতিতে বুরো বাংলাদেশ একধাপ এগিয়ে। বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন হওয়াতে আমার কাজের দক্ষতা সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার কাজের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের আইসিটি বিভাগ সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে যাচ্ছে। তারা সময়োপযোগী বিভিন্ন টেকনোলজিক্যাল বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদানের মাধ্যমে আমাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে। প্রয়োজনে তারা শাখায় বা এলাকা কার্যালয়ে এসে হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়ে আমার ডিজিটালাইজেশন কাজে সহযোগিতা করছে। আগে সব ধরনের রিপোর্ট হাতে করতে হলেও বর্তমানে আমরা সব ধরনের রিপোর্ট অনলাইনে জি-ব্যাংকার সফটওয়্যার থেকে এক নিমিষেই পেয়ে যাচ্ছি যা আমার কাজকে অধিকতর সহজ করে দিয়েছে।

গৃহবধূ থেকে উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্প

কাজের উদ্দেশে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টায় যখন প্রতারণার ফাঁদে পড়ে পরিবারের সব সঞ্চিত অর্থ খোয়া যায়, তখন হঠাৎই এক অপ্রত্যাশিত মোড় নেয় গৃহবধূ শিলার জীবন। স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে টাঙ্গাইলের রাথুরা গ্রামে বসবাস করেন শিলা বেগম। ছোটবেলায় ইচ্ছে ছিল পড়াশোনা করে চাকরি করবেন, সমাজে সম্মানের সাথে বাঁচবেন।

কিন্তু বিধি বাম! মাত্র ৯ বছর বয়সে বাবা হারান তিনি। সেই সাথে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলে যাওয়া। ঠিকমতো খাবারটাও জুটতো না বাড়িতে, ফলশ্রুতিতে শিলার মা তাকে একটি বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজে দিয়ে দেন। এরপর বয়স যখন সবে ষোলো, তাকে বিয়ে দেওয়া হয় ফল ব্যবসায়ী খন্দকার দিপুর সাথে। প্রথমে স্ত্রীর ভূমিকায় এবং পরে দুই সন্তানের জননীর ভূমিকায় জীবন চলতে থাকে তার।

এরপর হঠাৎই এলো সেই অপ্রত্যাশিত ধাক্কা। প্রতারক চক্রের ফাঁদে পড়ে স্বামীর বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার উদ্যোগে এতদিনের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছা যায়। প্রতারণার শিকার ও অর্থের অভাবে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন শিলার স্বামী। যমুনার চরে অন্যের জমিতে কাজ করা শুরু করেন। অভাব-অনটনে সংসারে অশান্তি লেগে থাকতো। উপায় না দেখে বড় ছেলেও পড়াশোনা ছেড়ে স্থানীয় একটি খাবার হোটেলে কাজ করা শুরু করে দেয়।

রূঢ় বাস্তবতার মুখে ছেলেকেও যখন লেখাপড়া বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়, শিলার মাতৃহৃদয় ভেঙে যায়। দৃঢ়সংকল্প নেন পরিবারের জন্য উপার্জন করার। ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করে যান দিনের পর দিন। দিনের বেলা করতেন যমুনা নদীর তীরে অন্য লোকের জমি থেকে বাদাম তোলার কাজ আর বিকালে পাকুটিয়া বাজারে পিঠা তৈরি ও বিক্রির কাজ। স্বামী-স্ত্রী ও ছেলের কঠোর শ্রমে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো। এবার শিলা সিদ্ধান্ত নিলেন স্বামীর ফলের দোকানটি নতুন করে শুরু করবেন।

কিন্তু আবারও প্রতিবন্ধকতা। শিলার স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একদিকে স্বামীর চিকিৎসার খরচ, অন্যদিকে একা হাতে ঘর-বাইরে সামলিয়ে উপার্জন করা। এই সংকটময় সন্ধিক্ষণেই শিলার জীবনযুদ্ধে সহায়কের ভূমিকায় বুরো বাংলাদেশের প্রবেশ। পিঠা বিক্রির এক বিকালে শিলার পরিচয় হয় বুরো বাংলাদেশের পাকুটিয়া শাখার কর্মী লিপি আক্তারের সাথে। তার সাথে প্রাথমিক আলোচনায় বুরো বাংলাদেশের ঋণ ও সঞ্চয় সেবা সম্পর্কে জানতে পারেন। পরের সপ্তাহে পাকুটিয়া শাখায় গিয়ে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। একটি ডিপিএস

খোলেন এবং কিছুদিন পর ১০ হাজার টাকার ঋণ প্রস্তাব করেন। ১০ হাজার টাকার সাথে নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে ছোট পরিসরে স্বামীর ফলের দোকানটি খোলেন শিলা। এরপর স্বামী সুস্থ হয়ে উঠলে শিলাকে ব্যবসায় সাহায্য করা শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে আয় বাড়তে থাকলো তাদের। এবার শিলা সুন্দরভাবে বাঁচার মনস্থির করলেন। শিলা জানান, 'যদিও আমার ছোটবেলা কেটেছে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, আমি সবসময় চেয়েছি সম্মানজনক কাজ করে সম্মানের সাথে বাঁচতে। বড় ছেলেকে ইতিমধ্যে দোকানের কাজ থেকে ছাড়িয়ে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন, মাধ্যমিক পাস করার পর বুরো থেকে ঋণ নিয়ে ছেলেকে একটি মুদি দোকান করে দেন শিলা। অন্যদিকে নিজের আয় থেকে প্রতি মাসে বুরোতে প্রায় ৫৫০০ টাকা সঞ্চয় হিসাবে জমা করছেন। বুরো থেকে ওয়াশ কর্মসূচির আওতায় ঋণ নিয়ে বাড়ির উঠানে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছেন শিলা। বুরো থেকে প্রাপ্ত নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য অভ্যাস বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিলার পরিবারে নিয়ে এসেছে সুস্বাস্থ্য। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পায়খানা ব্যবহারের বিষয়ে পরিবারের সকলকে জানিয়েছেন শিলা।

আর এভাবেই বুরো বাংলাদেশের হাত ধরে, একসময় জীবনযুদ্ধে সব হারাতে বসা শিলা খুঁজে পেয়েছেন নিজেকে, নিজ মর্যাদায় বেঁচে হাসছেন আত্মপ্রত্যয়ের হাসি। ■

মনীষা সেতু হাজং
● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

শিলা জানান, 'যদিও আমার ছোটবেলা কেটেছে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, আমি সবসময় চেয়েছি সম্মানজনক কাজ করে সম্মানের সাথে বাঁচতে।' বড় ছেলেকে ইতিমধ্যে দোকানের কাজ থেকে ছাড়িয়ে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন, মাধ্যমিক পাস করার পর বুরো থেকে ঋণ নিয়ে ছেলেকে একটি মুদি দোকান করে দেন শিলা।

দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ

ড. এম এ ইউসুফ খান

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল একটি দেশ। মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করে। এ দেশের সমাজব্যবস্থা গ্রামকেন্দ্রিক হলেও উন্নয়নের কাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি। বহুমুখী আর্থ-সামাজিক সমস্যা টেকসই উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধকতা। বিপুল জনগোষ্ঠী, সীমিত সম্পদ, শ্রেণিবৈষম্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিতিশীলতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। বেকারত্ব, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যা এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের গরিব মানুষগুলোর সীমাহীন দারিদ্র্য নতুন কোনো বিষয় নয় বরং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে।

এর মধ্যেই আবার করোনা মহামারির অভিঘাতে টানা দুই বছর বিপর্যস্ত থাকার পর গ্রামীণ অর্থনীতি বিশেষ করে ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা যখন ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ। ফলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এর প্রভাব। মূল্যস্ফীতির চাপে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠে দিশাহারা। জীবনধারণ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে ওঠে। সরকার এনজিও খাতের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করলেও ব্যাংকগুলো ওই তহবিল থেকে ঋণ বিতরণে তেমন কোনো আগ্রহ দেখায়নি। বরং তারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের লোন দিতেই বেশি মনোনিবেশ করে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত অসহায় গরিব মানুষগুলো যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যায়। এমনই পরিস্থিতিতে এনজিওর চলমান মাইক্রোক্রেডিট তথা ক্ষুদ্রঋণ হয়ে ওঠে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে এক বিশাল ভরসার স্থল।

সমাজে যে মানুষটি একেবারেই গরিব অসহায় এবং সর্বক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত সেই মানুষটির কাছে এনজিওর ক্ষুদ্রঋণ পাথর ঠুকে

আগুন জ্বালানোর মতোই ছোট্ট ঘটনা মনে হতে পারে কিন্তু আগুনটুকুই তাকে আশায় উজ্জীবিত করে, বেঁচে থেকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

> দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, হাওর, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বা চরাঞ্চলের মানুষের কাছে যখন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছায় না তখন এনজিওগুলোই হয়ে ওঠে তাদের ভরসাস্থল।

তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার লক্ষ্যে এনজিওগুলো সহজ শর্তে জামানতবিহীন পরিশোধযোগ্য যে অর্থায়ন করে থাকে তা-ই মূলত ক্ষুদ্রঋণ। দেশে কার্যত এনজিওগুলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মূল দায়িত্ব প্রতিপালন করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টার্গেটভুক্ত করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের সংগঠিত করে জীবনমুখী স্বল্প পরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

১৯৭০ সালের উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণ, ওষুধ, স্বাস্থ্যসেবা ও আশ্রয়জনিত পুনর্বাসনের কাজে কিছু সংখ্যক দেশি-বিদেশি এনজিও নিয়োজিত হয়। ক্রমান্বয়ে এসব এনজিও সেবামূলক ত্রাণ কর্মকাণ্ড থেকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ শুরু করে এবং পর্যায়ক্রমে তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে থাকে। বাংলাদেশে বড় বড় এনজিওগুলো এ সময়টাতে সংঘবদ্ধ হয়। ১৯৮০ সালের পর থেকে এনজিওর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনজিওগুলো বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং জনগণের দোরগোড়ায় তাদের সেবাধর্মী কার্যক্রম পৌঁছে দেয়। এসব কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তারা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান শুরু করে যার পরিধি এখন অনেক বিস্তৃত হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ক্ষুদ্রঋণ এক বহুল আলোচিত বিষয় যা আজ পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাঠামোতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ইতিমধ্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টার সীমাবদ্ধতা থাকায় কর্মরত এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে যে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা আজ আর কারও অজানা নয়।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, হাওর, দুর্গম পাহাড়ি এলাকা বা চরাঞ্চলের মানুষের কাছে যখন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পৌঁছায় না তখন এনজিওগুলোই হয়ে ওঠে তাদের ভরসাস্থল। ইতিমধ্যে দেশব্যাপী এনজিও সংস্থাগুলো দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ৩ কোটি ৩০ লাখেরও অধিক দরিদ্র পরিবারকে

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করেছে। এ ক্ষুদ্রঋণপ্রাপ্ত পরিবারগুলো হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু, মাছ চাষ, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, সবজি বাগান, দোকান ইত্যাদি ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করে নিজেরাও যেমন স্বনির্ভরতা অর্জন করছে তেমনই দেশজ উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয় তার ৭৩ শতাংশ অর্থের যোগান দেয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও খাত। অর্থাৎ বছরে ১ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ঋণ বিতরণ করে এনজিও খাত। জিডিপিতে মাইক্রোক্রেডিটের অবদান ১২ দশমিক ৫ শতাংশ। মাইক্রোফাইন্যান্স ইনস্টিটিউটগুলোর (এমএফআই) মাধ্যমে কর্মসংস্থান হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার মানুষের। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন মহলের রয়েছে নানা কথাবার্তা, মতভেদ ও অস্পষ্টতা। কেউ কেউ মনে করেন, ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য নিরসনে কোনো ভূমিকা তো রাখছেই না বরং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণের জালে আবদ্ধ করছে কিংবা ঋণগ্রহীতারা তাদের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে ভিটেমাটি হারাচ্ছে। তবে নিরপেক্ষ গবেষণা বলছে, দেশের আর্থ-সামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ক্ষুদ্রঋণের প্রভাব ও তার বাস্তবতায় সমাজের চিন্তাশীল মানুষরা কী চোখে দেখছেন তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, 'ক্ষুদ্রঋণ' দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র হাতিয়ার নয়, শুধু এটি দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তবে ক্ষুদ্রঋণ সমাজে অনেক পরিবর্তন এনেছে। নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে এ কার্যক্রম। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে এখন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাও সৃষ্টি হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ভিত্তি নেই। প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থা থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না প্রভাবশালী ঋণগ্রহীতারা। কিন্তু দরিদ্র মানুষ যারা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে পরিশোধ করছেন তাদের বিদ্যমান ব্যাংকিং সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন, 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে কি না তা নিয়ে হয়তো বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু এটি একটি উদ্ভাবনী ব্যাংকিং। প্রচলিত ব্যাংকিং যখন গরিব মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না, সেখানে তারা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে আর্থিক সেবা পাচ্ছেন। ক্ষুদ্রঋণের জন্য যে তহবিল আসে তা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদহার দিতে হবে, বিষয়টি তা নয়। বরং ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার এমন জায়গায় রাখতে হবে যা দিয়ে ঋণের পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা যায়। ক্ষুদ্রঋণের জালে গরিবরা আটকে পড়ছে কি না এ বিষয়ে তিনি বলেন, ঋণ ক্রমান্বয়ে বাড়তে পারে। কিন্তু দেখতে হবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার সম্পদ বাড়ছে কি না। কিংবা নিট সম্পদে ওই ব্যক্তি আরও দরিদ্র হলো কি না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেউদ্দীন আহমেদ বলেন, 'ক্ষুদ্রঋণ প্রচলনের আগে দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। বহু মডেল হয়েছে কোনো কাজ হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ হলো দরিদ্রদের জন্য মহাসড়কের মতো, এটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম। ক্ষুদ্রঋণ না থাকলে দরিদ্র মানুষের যে কি হতো তা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।'

বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক ড. বিনায়ক সেন বলেন, 'অনেকেই বলে থাকেন, এত ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার পর কেন দারিদ্র্য বিমোচনে নাটকীয় পরিবর্তন হয়নি। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শুধু ক্ষুদ্রঋণ প্রবর্তিত হয়নি। মহাজনি ব্যবসার বিকল্প হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা এসেছে। এটি দরিদ্র মানুষের বিকল্প আয়ের উৎস। দারিদ্র্য বিমোচন কেন হলো না– একই অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধেও উঠতে পারে। কেননা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।'

বিশিষ্টজনদের অভিমতের আলোকে এ কথা আজ অনস্বীকার্য যে ক্ষুদ্রঋণ নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করছে এবং হতদরিদ্র মানুষকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে তাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করছে। দারিদ্র্যপীড়িত নারীরা খুঁজে পাচ্ছেন তাদের জীবনের মানে। সংসারে, সমাজে আজ তারা আর উপেক্ষিত নয়, নিগৃহীত নয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের স্বপ্ন সহযাত্রী।

তৃণমূল পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য নিরসনকল্পে ক্ষুদ্রঋণের এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, এটাই আমাদের কাম্য। ■

● চেয়ারপার্সন, গভর্নিং বডি
বুরো বাংলাদেশ

ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে অর্জিত হবে স্বনির্ভর বাংলাদেশ

ফেরদৌস সালাম

সৃষ্টিকর্তা সৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবী নামক গ্রহের মানুষ প্রতিনিয়ত উন্নত প্রযুক্তির ধারায় বদলে দিচ্ছে জীবন ধারার বিভিন্ন উপকরণ। মানব জীবনে 'অর্থ' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থকে প্রায়োগিকভবে কাজে লাগানোর জন্য দেশে দেশে নিজস্ব কারেন্সি বা মুদ্রা রয়েছে। গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে এক দেশের মুদ্রার সাথে আরেক দেশের মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা বিদ্যমান। উন্নত প্রযুক্তি এখন সেই মুদ্রার পরিবর্তন ঘটিয়ে ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহারের মাধ্যমে 'ক্যাশলেস' অর্থাৎ মুদ্রাবিহীন লেনদেন জগতে প্রবেশ করছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের পৃথিবী হতে যাচ্ছে মুদ্রাবিহীন। এই ঋণে পৌঁছুতেই মানুষ ব্যাংকিং, নন ব্যাংকিং এবং ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসকে কাজে লাগাচ্ছে। বর্তমান সময়ে কাউকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সরাসরি কোথাও যাওয়ার বা উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করেই কাজটি সম্পন্ন করা যাচ্ছে এবং লেনদেনের অর্থও সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হয়ে যাচ্ছে।

এ ধরনের একটি উন্নত ব্যবস্থায় আসতে আর্থিক খাতে বিশেষ করে ব্যাংকিং খাতকে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটাতে হয়েছে। এর মধ্যে এটিএম (অটোমেটেড ট্রেলার মেশিন), সিআরএম (ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিন), এজেন্ট ব্যাংকিং, বিইএফটিএন (বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক), এনপিএসসি (ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ), কিউ আর কোড, বিনিময় ইত্যাদি।

ব্যাংকিং ও নন ব্যাংকিং আর্থিক খাতের এই ব্যবস্থার সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যুক্ত হয়েছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে মানুষটির কোনো ব্যাংক হিসাব নেই, তিনিও পাচ্ছেন লেনদেনের সুযোগ। কোভিড মহামারির মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫০ লাখ পরিবারকে এমএফএসের মাধ্যমে প্রত্যেককে ২,৫০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করেছেন। বলা যায়, বর্তমান সময়ে 'এমএফএস' আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে

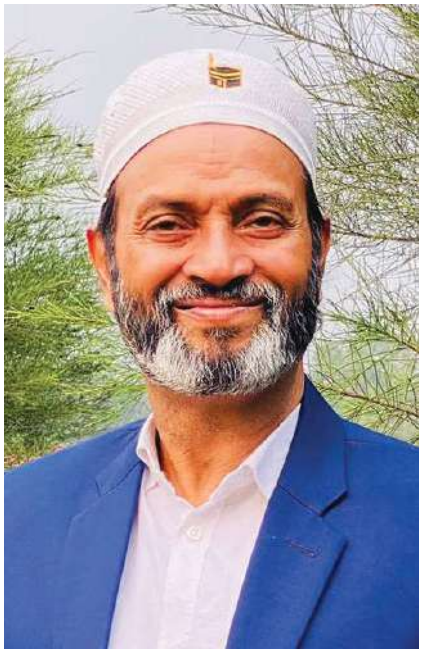

> দেশ ধীরে ধীরে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুতে পারছে, তেমনি ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এগুলো সবই মূলত ডিজিটাল ফাইন্যান্স সার্ভিসেস অর্থাৎ ডিএফএসের অন্তর্ভুক্ত। ডিজিটাল ফাইন্যান্স হলো আর্থিক পরিষেবা শিল্পে নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বর্ণনা করতে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ। বাংলায় অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই শব্দটি বাংলার শব্দ হয়ে পড়ছে। এই ডিজিটাল শব্দ বিভিন্ন ধরনের পণ্য, অ্যাপ্লিকেশন, প্রক্রিয়া এবং ব্যবসায়িক মডেল রয়েছে যা ব্যাংকিং এবং আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ঐতিহ্যগত উপায়ে রূপান্তরিত করেছে। মূলত ডিজিটাল ফাইন্যান্স হচ্ছে নতুন আর্থিক প্রযুক্তি যা আর্থিক পরিষেবাগুলোকে অ্যাক্সেস সহজতর করতে পারে এবং আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা উন্নয়ন করতে পারে।

অবশ্য এটি বাস্তব যে, ফাইন্যান্সে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নতুন নয়। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভাবনের গতিও এখন দ্রুত। মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি। আমরা অর্থ প্রদান করি, অর্থ স্থানান্তর করি এবং বিভিন্ন ধরনের নতুন টুল ব্যবহার করে বিনিয়োগও করতে পারি যা কয়েক বছর আগেও ছিল না। প্রযুক্তির হাত ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক নেটওয়ার্ক, মেশিন লার্নিং, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ডিস্ট্রিবিউটেড লেজার টেকনোলজি, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নতুন বাজারে প্রবেশকারীদের দ্বারা নতুন পরিষেবা এবং ব্যবসায়িক মডেলের জন্ম দিয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন পেমেন্ট এবং স্থানান্তর পরিষেবা, পিয়ার টু পিয়ার ঋণ এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ পরামর্শ এবং পরিষেবা এসবই এখন ডিজিটাল ফাইন্যান্স হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতিকেও গ্লোবালাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছে।

ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এবং ডিএফএস

বাংলাদেশ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির পথে হাঁটছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৬ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে। বলা প্রয়োজন যে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবার আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক। আর সবাইকে যখন ডিজিটাল লেনদেনে আনা যাবে, তখন আর ক্যাশ আউটের প্রয়োজন হবে না, এটি করতে আন্ত অর্থ-সংযোগের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এই সংযোগ এমএফআই, এমএফএস, এজেন্ট

ব্যাংকিং ও ব্যাংকগুলোর মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হবে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে প্রায় ৬৫ কোটি হাজার টাকা লেনদেন এবং মোবাইল আর্থিক সেবা এমএফএস এ ৯০ হাজার কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে।

ডিএফএস : ব্যয় সাশ্রয়ী

একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, ডিজিটাল ফাইন্যান্স প্রযুক্তির ব্যবহার বাজারের দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার জন্য বেশ কিছু সুবিধার দিকে নিয়ে যায়। এখানে কিছু মূল বিষয় রয়েছে যে ডিজিটাল ফাইন্যান্স একদিকে যেমন আর্থিক লেনদেনের গতি এবং তৎপরতা বাড়িয়ে দেয়, তেমনি লেনদেনের খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। বর্তমান বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় টিকে থাকার জন্য ডিজিটাল ফাইন্যান্স অপরিহার্য। এটি দ্রুত সময়ে লেনদেন, কম খরচ এবং সুবিন্যস্ত আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে। ডিজিটাল ফাইন্যান্স বিকল্পগুলো অর্থের অ্যাক্সেস উন্নত করে, অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়াগুলোকে স্ট্রিম লাইন করে এবং নতুন রাজস্ব উৎপাদনের সুযোগ তৈরি করে এমএফএস পরিচালনার পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেছে।

দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

ডিজিটাল ফাইন্যান্স সিস্টেম দেশে দেশে দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে এই পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের ব্যাপকহারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন চমক নিয়ে এসেছে। উল্লেখ্য, এ দেশে এখনও প্রায় ৪৭% মানুষ ব্যাংকিং সিস্টেমের বাইরে রয়েছে। তাদের পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা এবং ঋণ নেওয়া চ্যালেঞ্জিং বিষয়। সেক্ষেত্রে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং হিসাব না থাকলেও এক ব্যাপক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন এনজিও/এমএফআইয়ের সদস্য হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ পাচ্ছে এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্স সার্ভিস এখন তারা দ্রুততার সাথে লেনদেন করতে পারছে। তারা মোবাইল ফোনের সাহায্যে দ্রুত ঋণ গ্রহণ করতে পারছে এ জন্য সময় ব্যয় করে কেন্দ্রে আসার প্রয়োজন হচ্ছে না এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও তাই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে (খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২) বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ১৮.৭ শতাংশ। ছয় বছর আগে ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৩ শতাংশ। অতি দারিদ্র্যের হারও কমেছে। ২০২২ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী দেশে অতি দারিদ্র্যের হার এখন ৫.৬ শতাংশ যা ২০১৬ সালে ছিল ১২.৯%। বিবিএস মনে করে দারিদ্র্য বিমোচনের

> **তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নয়ন ধারার সাথে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতে দেশের এনজিও/এমএফআই সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করছে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ পরিবার। একসময় যারা ছিল নিরক্ষর, দেশ সম্পর্কে বা নিজেদের সমাজ সম্পর্কেও ছিল অসচেতন তারা এখন স্মার্ট ফোন ব্যবহারেও দক্ষ।**

এই ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩১ সালের মধ্যে দেশ দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ

বেশ কয়েকটি ব্যাংক 'ন্যানো লোন' হিসেবে পরিচিত ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ চালু করেছে। ব্যাংকগুলোর তথ্য অনুসারে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার গ্রাহক এ ধরনের ঋণ নিয়েছে। এর খেলাপির হার ১ শতাংশের কম। ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সিটি ব্যাংকের সহযোগিতায় বিকাশ ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ চালুর পর থেকে আরও তিন ব্যাংক এই সেবা চালু করেছে। অনলাইনে ঋণের আবেদনের ২/৩ ঘন্টার মধ্যে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয় বলে জানা যায়।

ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপ, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বা ই-ওয়ালেট সেবা ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। বুরো বাংলাদেশসহ দেশের বেশ কয়েকটি এমএফআই ডিজিটাল পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ এবং সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকদের সেবা প্রদান করছে। ভবিষ্যতে এই হার শতভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে এমএফআই সেক্টরের মাধ্যমে ৩ কোটি ২৫ লাখের বেশি পরিবারকে আর্থিক সেবার মধ্যে আনা হয়েছে যাদের মধ্যে ৯৬% নারী। এতে করে বিপুল সংখ্যক মানুষের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছে। ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা প্রাপ্তিতে দেশের গতিশীল উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে এ সেক্টরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত।

ইন্টারনেট সংযোগ : বাড়িয়ে দিচ্ছে কর্মক্ষমতা

টেলিনর এশিয়া পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মনে করেন, মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের প্রায় ৮ হাজার ব্যবহারকারীর মধ্যে 'ডিজিটাল লাইভস ডিকোডেড' শীর্ষক এক সমীক্ষা চালানো হয়। এতে মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগের কারণে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও নতুন ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির মতো কিছু বিষয় উঠে এসেছে। বাংলাদেশিদের মধ্যে ৫৭ শতাংশ মনে করেন, তারা আয়ের নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ৫৪ শতাংশ মনে করেন নতুন চাকরি ও কর্মজীবনের খোঁজ পেতে পারেন। এছাড়া ৫৭ শতাংশ মনে করেন মোবাইল ইন্টারনেট প্রযুক্তির কারণে তাদের কর্মদক্ষতা ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং ২৬ শতাংশ মনে করেন তাদের দক্ষতা বেড়েছে ৫৯ শতাংশের বেশি। জেন্ডারভিত্তিক তুলনায় ৭৩ শতাংশ নারী ও ৬৭ শতাংশ পুরুষ বলেছেন তাদের কর্মজীবন ও দক্ষতা বিকাশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করছে।

তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নয়ন ধারার সাথে তাল মিলিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এই এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুতে দেশের এনজিও/এমএফআই সেক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের সুবিধা ভোগ করছে প্রায় ৩ কোটি ২৫ লাখ পরিবার। একসময় যারা ছিল নিরক্ষর, বিশ্ব তো দূরের কথা দেশ সম্পর্কে বা নিজেদের সমাজ সম্পর্কেও ছিল অসচেতন তারা এখন স্মার্টফোন ব্যবহারেও দক্ষ। তারা জানে কীভাবে লেনদেন করতে হয়। কীভাবে ম্যাসেজ পাঠাতে হয়। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিই দেশকে স্থিতিশীল উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপনে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে।

দেশ ধীরে ধীরে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুতে পারছে, তেমনি ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবেই দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল ফাইন্যান্স সার্ভিস সাধারণ মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যাংক হিসাববহির্ভূত একজন মানুষকেও লেনদেনের সুযোগ এনে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডিএফএসের এই সেবা ব্যাংকের চেয়েও অধিক সেবামনস্ক। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ ডিএফএসের সেবা প্রক্রিয়ায় লেনদেনের ক্ষেত্রে পারদর্শী হবে, অর্থনীতি হবে ক্যাশলেস। প্রতিষ্ঠা লাভ করবে স্বনির্ভর সোনার বাংলা। সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করছে বুরো বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র অর্থায়নের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ■

● সম্পাদক, প্রত্যয়

মাইক্রোফাইন্যান্স

ডিজিটাল যাত্রার মুক্তগদ্য

বিদ্যুত খোশনবীশ

ডিজিটালাইজেশন ধারণাটি আমাদের কাছে যতটুকু বোধগম্য, আমরা তার চেয়েও বেশি ডিজিটাল। অর্থাৎ ডিজিটালাইজেশন কী তা বুঝে ওঠার অনেক আগে থেকেই আমরা ডিজিটাল হতে শুরু করেছি। কারণ, অধিকাংশ মানুষই প্রযুক্তি ও ডিজিটালাইজেশনের ভোক্তা, তারা এগুলোর রসায়ন বা ক্রিয়াকৌশল বোঝার আকাঙ্ক্ষা খুব কমই বোধ করেন। আমাদের এই স্বভাব শুধু প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই নয়, সমাজ জীবনের অধিকাংশ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে যদি সরকার কিংবা জনপ্রশাসনের কথা বলি, সেক্ষেত্রেও আমরা অভিন্ন। নির্বাচনের দিন ভোট দিয়ে আমরা শান্ত হয়ে যেতে চাই এই আশায় যে সরকার জনগণকে কল্যাণমূলক সেবা দেবে। এ জন্য জনপ্রশাসন পরিচালনা করার যে প্রক্রিয়া তা আয়ত্ব করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকে না। অর্থাৎ আমরা সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়া বুঝি আর নাই বুঝি এর সুফল ঠিকই পেতে চাই, কারণ আমরা সরকারের সেবাকর্মের প্রধান ভোক্তা।

ডিজিটালাইজেশন ধারণাটি দেড় দশক আগেও ছিল, এখন অনেকটা জোরালো এবং ভবিষ্যতে আরও জোরালো হয়ে স্তিমিত হয়ে যাবে বলে আমার অনুমান। কারণ আরও এক থেকে দেড় দশক পর ডিজিটালাইজেশন তার অধিকাংশ সুফল নিয়ে আমাদের চিন্তা ও ব্যবহারিক জীবনে একীভূত ও নিয়মিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমরা অনেক বেশি ডিজিটাল হয়ে উঠব কিন্তু ডিজিটালাইজেশন ধারণাটি আর আমাদের চিন্তার জগৎকে খুব একটা নাড়া দেবে না। ২০০৮ সালের কথা যদি বলি, তখন বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনি অঙ্গীকার হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প তুলে ধরেছিলেন। তারিখ ছিল ১২ ডিসেম্বর- প্রতি বছর এই দিনটি পালিত হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস হিসেবে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রাজনৈতিক স্লোগান হওয়ায় সে সময় এ ধারণাটি সমালোচিত হয়েছিল এবং একই সাথে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কেমন বাংলাদেশ হবে সাধারণ মানুষের মধ্যেও তা নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল। কিন্তু গত ১৫ বছরে সেই অস্পষ্টতা দূর হয়েছে এবং সমালোচনাও স্তিমিত হয়ে গেছে। কারণও স্পষ্ট, দেশের মানুষ ডিজিটালাইজেশন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ ধারণার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ও সুফল পেতে শুরু করেছে। এই সাফল্যের প্রধানতম কারণ হলো, ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগের উদ্যোক্তা সরকার হলেও এর অংশীদারত্ব বিস্তৃত হয়েছে বেসরকারি খাত এবং ব্যক্তি পর্যায়েও। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টর, যাকে আমরা সংক্ষেপে এমএফআই বলি, এটিও এই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম সফল অংশীদার।

বাংলাদেশের এমএফআই সেক্টর ডিজিটাল হওয়ার যাত্রা শুরু করেছিল মোটাদাগে গত ছয় বছর আগে। বুরো বাংলাদেশ এই যাত্রার প্রথম পথিক দলের গর্বিত সদস্য। দেশের শীর্ষস্থানীয় অন্যান্য কয়েকটি এমএফআই যেমন ব্র্যাক, আশা, শক্তি ফাউন্ডেশন ও সাজেদা ফাউন্ডেশনও একই পরিচয় বহন করে। যেকোনো যাত্রার শুরুর পদক্ষেপগুলো হয় দীর্ঘ বিরতি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে। সঠিক গন্তব্যে পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপ বা প্রচেষ্টাই হয় সচেতন ও সতর্ক। বুরো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের এমএফআই সেক্টরের ডিজিটাল যাত্রার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে প্রথম তিন বছরের তুলনায় পরের তিন বছরে এই যাত্রার অগ্রগতি বেশি চাক্ষুষ ও সফল। মানুষ এখন ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরের ডিজিটালাইজেশনের সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে। তারা ঘরে বসে কিংবা গৃহস্থালি কাজের সামান্য অবসরে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছে মুঠোফোন দিয়েই। অল্প ব্যবধানেই পেয়ে যাচ্ছে তার দেনা পরিশোধ ও সঞ্চয়ের টাকা জমা রাখার ডিজিটাল নিশ্চয়তা। এটুকু দৃশ্যমান সুফল। একজন ভোক্তার জন্য এটুকুই অত্যাবশ্যকীয়।

ভবিষ্যতে ভোক্তা বা গ্রাহকদের জন্য আর কী কী সেবা অত্যাবশ্যকীয় হবে তা বলে দেবে সময়, প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা এবং বাজার চাহিদা। কিন্তু আজকের কথাই বলি কিংবা আগামী কালের, গ্রাহকের জন্য এই ন্যূনতম ডিজিটাল সেবা সুনিশ্চিত করতে এমএফআইগুলোকে যেতে হচ্ছে বহুমাত্রিক প্রযুক্তির আত্মীকরণ, এর ব্যবহার দক্ষতা অর্জন ও নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করতে। অর্থাৎ আমরা ডিজিটালাইজেশনের যে রূপ দেখছি বা জানছি তা শুধুই বাহ্যিক, অভ্যন্তরে ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার সীমা আরও বিস্তৃত।

প্রতিটি ক্ষুদ্র অর্থায়ন সংস্থার মৌলিক সেবা কর্মসূচি সংগঠিত ও পরিচালিত হয় শাখা থেকে। শাখায় প্রযুক্তি যন্ত্র স্থাপন, এগুলো ব্যবহারে কর্মীর দক্ষতা সৃষ্টি ও উন্নয়ন, বহুদিন ধরে জমে ওঠা কাগুজে তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাকে ডিজিটাল রূপান্তর, প্রযুক্তি যন্ত্রের অদৃশ্য প্রাণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ও বৈদ্যুতিক সংযোগ; অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, কম্পিউটার সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপস নির্মাণ, গ্রাহকের চাহিদা উপলব্ধি করতে বাজার থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমকালে অন্যান্য আর্থিক সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্থাপন ডিজিটালাইজেশনের অভ্যন্তরীণ

প্রক্রিয়ার মৌলিক উপকরণ। এগুলো এবং আমাদের মতো সাধারণের অজানা আরও যা কিছু আছে সেগুলো মিলেই সম্পন্ন হয় ডিজিটালাইজেশনের বিশাল ও জটিল কর্মযজ্ঞ। এই কর্মযজ্ঞে অজ্ঞাতে বসবাস করে নিরাপত্তা হুমকি ও গ্রাহকের আস্থা অর্জনে বহুরূপী প্রতিবন্ধকতা।

তবে প্রতিবন্ধকতা সাফল্য ও উদ্ভাবনী শক্তির সহায়ক। ২০২০ এর বৈশ্বিক করোনা মহামারি পুরো বিশ্বকে বিপর্যস্ত করে ফেললেও ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতাই কাজ করেছে নতুন নতুন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে। দেশের সরকারি ও অন্যান্য বেসরকারি খাতের মতো এই ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশের এমএফআই সেক্টরও উন্মোচন করেছে অসংখ্য ফলপ্রসূ ডিজিটাল ধারণা।

গৃহবন্দিত্বকে মেনে নিয়েও এই সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মী ও গ্রাহকের সাথে সংযোগ বজায় রেখেছে ডিজিটাল উদ্ভাবনীর মাধ্যমে। মাঠের কর্মসূচি বন্ধ থাকলেও কর্মীদের বেতন-বোনাস নিয়মিত থেকেছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অংশীদার হিসেবে ভূমিকা রেখেছে বিকাশের মতো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা এমএফএস এবং গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের মতো মোবাইল ফোন অপারেটরগুলো। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরের ডিজিটাল যাত্রায় এমএফএস ও মোবাইল অপারেটরগুলো এখন অবিচ্ছেদ্য সহযাত্রী। তাদের অনস্বীকার্য ও অনিবার্য সহযোগিতা নিয়েই এদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টর শুরু ও পরিচালনা করছে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বা ডিএফএস। বুরো বাংলাদেশসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্যই হলো দেশের ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থেকে যাওয়া বিপুলসংখ্যক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এনে দারিদ্র্য বিমোচন করা। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস তাদের লক্ষ্য অর্জনের এই প্রচেষ্টায় কাঙ্ক্ষিত গতি এনে দিয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর এমএফআই সেক্টরের বহু আগেই ডিজিটালাইজড হয়েছে ও ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানে উৎকর্ষ অর্জন করেছে। এমএফএস ও ব্যাংকগুলোর ডিজিটালাইজেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও মোবাইল ব্যাংকিং পদ্ধতি সন্দেহাতীতভাবে টেকসই। ডিজিটাল ব্যাংক এই সেক্টরের নতুন সংযোজন। এর আগে ২০২১ সাল থেকে শুরু হয়েছে এমএফএস ও ব্যাংকের যৌথ অংশীদারত্বে 'ন্যানো লোন' সেবা। এমএফআই সেক্টরে যা মাইক্রোক্রেডিট, এমএফএস সেক্টরে তা ন্যানো লোন। এখানে দুই সেক্টরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং সাধারণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সুদৃঢ় অর্থনীতিই মুখ্য। কিন্তু আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যাপকতার বিচারে ক্ষুদ্র অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোই এগিয়ে, কারণ এমএফআইগুলো যে প্রান্তজনের ব্যাংক তা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। ফলে এই সেক্টরের ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের প্রভাব ব্যাংকিং সেক্টরের তুলনায় বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক এবং হচ্ছেও তাই।

তবে ডিজিটালাইজেশন কিংবা ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের প্রভাব এমএফআই সেক্টরে যতই ফলপ্রসূ ও ব্যাপক হোক না কেন এই সেক্টরের সেবাগ্রহীতা বা ভোক্তা এবং সাধারণ মানুষও এর রূপ-রসায়ন সম্পর্কে বরাবরই ক্ষুদ্র আগ্রহ দেখিয়ে যাবেন। কারণ শুরুতেই বলেছি, প্রক্রিয়ার চেয়ে প্রক্রিয়ার সুফলই গ্রাহকদের বেশি কাঙ্ক্ষিত। সন্দেহ নেই, এমএফআইগুলো ডিজিটালাইজেশন ও ডিএফএসের সুফল তাদের গ্রাহকদের দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারছে। তবে সেই সাথে ডিজিটালাইজেশন ও ডিএফএস সম্পর্কে সাদামাটা একটি ধারণাও গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এই ধারণা গ্রাহকের কাছে শিক্ষা হিসেবে নয়, যেতে হবে তথ্য হিসেবে। আর এই তথ্য যদি পৌঁছে দেওয়া যায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তা হলে সে তথ্য হবে কম পীড়াদায়ক ও বেশি উপভোগ্য। এই দুই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এমন যেকোনো কিছুই উৎকৃষ্ট শিক্ষা হিসেবে মানুষের মন ও মগজে স্থায়িত্ব অর্জন করে।

প্রত্যয়ের এই 'ক্ষুদ্র অর্থায়নের ডিজিটাল যাত্রা' সংখ্যায় আমরা সেই চেষ্টাই করেছি। পুরোপুরি নয়, কিছুটা। কারণ কোনো কিছুকে কম পীড়াদায়ক ও বেশি উপভোগ্য করে তোলা মোটেই সহজ কাজ নয়। ক্ষুদ্র অর্থায়ন সেক্টরের সেবা সম্পর্কে বিপুলসংখ্যক মানুষের ধারণা রয়েছে এবং স্পষ্ট ধারণার ঘাটতি রয়েছে আরও বিপুলসংখ্যক মানুষের মধ্যে। কিন্তু তারপরও এই সেবা প্রদান প্রক্রিয়াগুলো কী কী এবং কীভাবে এগুলোর ডিজিটালাইজেশন করা সম্ভব হয়েছে এ সংখ্যায় আমরা সেটাই তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছি। পাঠক ভেদে এর লেখাগুলো তথ্য কিংবা উপাত্ত হিসেবে ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের ধারণা। ৩১তম এই সংখ্যার মাধ্যমে প্রত্যয় পদার্পণ করেছে এর প্রকাশনার ৯ম বর্ষে। এই সংখ্যায় দেশের যে বিশিষ্টজনরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, লিখেছেন ও মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। ■

● নির্বাহী সম্পাদক, প্রত্যয়

এম. মোশাররফ হোসেন

ডিজিটালাইজেশন ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতকে গতিশীল করেছে

দেশের অন্যতম বৃহত্তম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে বুরো বাংলাদেশ বিগত ৩২ বছর ধরে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর, বিশেষত নারীদের সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে যাচ্ছে। যার মাধ্যমে ২৬ লক্ষের বেশি সদস্য সংস্থার আর্থিক সেবার আওতাভুক্ত হয়েছেন। ১৯৯১ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই বুরো বাংলাদেশ সদস্যদের জন্য নতুন পরিষেবার সংযুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী মনোভাব থেকে নতুন নতুন আর্থিক এবং অ-আর্থিক সামাজিক পরিষেবা সংযোজন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার কার্যক্রমের প্রতিটি পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশন বিষয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশনের আগে অর্থাৎ সংস্থা যখন প্রথম সদস্যদের জন্য সেবা প্রদান শুরু করে সে সময় সব কাজ হতো কাগজে-কলমে। যার কারণে সাথে সাথে সব শাখার তথ্য প্রাপ্তি, মনিটরিং, শাখা থেকে নগদ বা ঋণ বিতরণ এসব কোনো কিছুই তাৎক্ষণিক জানার সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে শাখার হিসাব-নিকাশ সবকিছু কাগজে-কলমে থাকায় হিসাবে ভুলের সুযোগ ছিল এবং ভুল সংশোধনে শাখা কর্মীদের প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো। এখন ডিজিটালাইজেশনের যুগে সব তথ্য দ্রুত আমাদের কাছে আসে এবং আমরা সে অনুযায়ী মাঠে নতুন নির্দেশনা দ্রুত প্রদান করতে পারি। এতে সংস্থার কর্মসূচিতে যেমন কর্মদক্ষতা বেড়েছে তেমনিভাবে হিসাবে স্বচ্ছতা এসেছে। এই হিসাবের স্বচ্ছতার জন্য আমরা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মাননাও পেয়েছি। সব হিসাব, রিপোর্ট ও তথ্যসমূহে স্বচ্ছতা আসার ফলে অভ্যন্তরীণ ও বহি অডিট সহজ ও স্বচ্ছ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এসব ডিজিটালি সংরক্ষিত তথ্যসমূহ ব্যবহার করে সদস্যদের সেবা প্রদান সহজতর হবে বলে ধারণা করা যায়। কারণ, সামগ্রিক কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সংস্থার সেবা প্রদান পদ্ধতিকে সদস্যদের জন্য সহজে উপলব্ধ করা সম্ভব হবে। যা সংস্থার কর্মসূচি ও সেবা প্রদানকে দিন দিন আরও কর্মদক্ষ করবে এবং এতে সবশেষে সংস্থার সাথে সংযুক্ত গ্রাহকই উপকৃত হবেন। এছাড়াও বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সংস্থার সেবা প্রদানের পরিসর দক্ষতার সাথে সম্প্রসারণ করতে হলে ডিজিটালাইজেশন ও অটোমেশনের কোনো বিকল্প নেই বলে আমি মনে করি।

সংস্থার ডিজিটালাইজেশনের ফলে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Internal Control) ব্যবস্থায় যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটেছে, এতে সদস্যের পাশবই ব্যালেন্স ও লেজার হালনাগাদ সাথে সাথেই করা যাচ্ছে এবং এই কাজে প্রয়োজনীয় সব চেকপয়েন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সিস্টেম থেকে নিয়ন্ত্রণ ও অডিটিং সম্পন্ন করা যাচ্ছে, যার ফলে সংস্থা গ্রাহক সুরক্ষা নীতি মেনে সব সেবা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে ও সার্বিকভাবে আর্থিক অনিয়মের সম্ভাবনাগুলো হ্রাস পেয়েছে।

দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হওয়ার সুবাদে আমরা বিভিন্ন দেশি-বিদেশি, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত উদ্যোগে কাজ করা এবং সেবা গ্রহণের সাথে জড়িত। সংস্থার সব ধরনের রিপোর্টিং, ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও অ্যাকাউন্টিং প্রক্রিয়াদি ডিজিটালাইজেশনের ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে অনেক স্বচ্ছতা ও সহজলভ্যতা এসেছে, যা সংস্থাকে মানসম্মত সেবা প্রদানে সাহায্য করছে। ■

● প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ
বুরো বাংলাদেশ

মো. সিরাজুল ইসলাম

প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে বাংলাদেশ উন্নত হচ্ছে

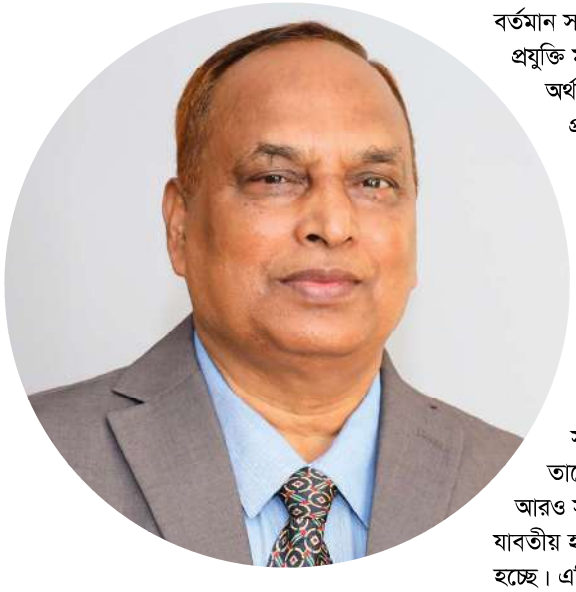

বর্তমান সময় ডিজিটালাইজেশনের যুগ। বুরো বাংলাদেশ শুরু থেকেই আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী। কারণ, প্রযুক্তি মানুষের জীবনমান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে সহজ করে দেয়। আমরা যারা দেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে জড়িত, লাখ লাখ দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছি, তাদের পক্ষে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সহজ ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সময়োপযোগী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে ডিজিটালাইজেশনের কারণে। ডিজিটালাইজেশন মূলত মানুষের কর্মবিস্তৃতি ঘটায়, কর্মকে সূচারুরূপে বাস্তবায়নের সুযোগ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে ডিজিটালাইজেশনের ব্যবহার অপরিহার্য। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এক দেশের মানুষ অন্য দেশের মানুষের সাথে সহজ যোগাযোগ স্থাপনসহ সব কার্যক্রমে একটা বিশ্ব হয়ে গেছে। বিশ্ব চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ এতদিন যে গ্লোবাল ওয়ার্ল্ডের কথা বলা হতো তা এই ডিজিটালাইজেশন এনে দিয়েছে।

বুরো বাংলাদেশের কর্ম এলাকা সারা দেশব্যাপী। আমাদের গ্রাহক সদস্যের সংখ্যা প্রায় ২৬ লাখেরও বেশি। সংস্থার কর্মীর সংখ্যা ১১ হাজারের মতো। সংস্থার কর্মীদের প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করতে হয়। ঋণ বিতরণ, কিস্তি আদায়সহ সংস্থার সচেতনতামূলক কার্যক্রম তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরাসরি যেতে হতো। ডিজিটালাইজেশনের ফলে তার এই কাজটি আরও সহজতর হয়েছে। কম্পিউটার অ্যাপস বা মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে মুহূর্তেই ঋণ গ্রহীতার যাবতীয় হালনাগাদ তথ্য জানা যায়। এতে আমাদের সংস্থার কর্মীদেরও দক্ষ ও প্রশিক্ষিত হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। এটিও কিন্তু একটি দিক যে এর ফলে দেশে প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবার আমাদের কর্মীরা সাধারণ গ্রাহকদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলছে। গ্রাহকরাও অ্যাপস ব্যবহার করে লেনদেন করছে। তাদের আর সময় ব্যয় করে শাখায় বা কার্যালয়ে আসতে হচ্ছে না। এমনকি তারা এখন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে ব্যাংক লেনদেনসহ বুরো বাংলাদেশের কার্যক্রম সম্পর্কেও জানতে পারছে। তারাও দক্ষ হচ্ছে এই প্রযুক্তির সাথে। এই যে প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারা এর ফলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার উপায় পেয়ে যাচ্ছে। সেবার মান দ্রুত এবং স্বচ্ছতার সাথে কাজ হচ্ছে।

ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির পাশাপাশি সংস্থার মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচির 'স্বাস্থ্যশিক্ষা বার্তা' অ্যাপসের মাধ্যমে ঘরে বসে প্রসূতি ও নবজাতকের সেবাসহ মৌলিক স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ের অনেক তথ্য জানা যায়। এছাড়া নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে অনলাইন প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল রয়েছে যার মাধ্যমে যে কেউ WaSH বিষয়ক সম্যক ধারণা পেতে পারেন। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টারে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগীর সেবাসহ অনলাইন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যখন ম্যানুয়ালি কাজ করেছি তখন অনেক ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকত, ভুল হলে ধরা পড়ত বেশ দেরিতে– কিন্তু এখন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কাজ হচ্ছে নির্ভুলভাবে। এই মাধ্যম ব্যবহার করায় সময় বাঁচে, দ্রুত কাজ হচ্ছে আবার অতি সহজেই সব পর্যায়ে তথ্য পাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। ম্যানুয়ালি কাজের ক্ষেত্রে কোনো কর্মীর ভালোমন্দ জানা ছিল বেশ কঠিন। এখন সংস্থার কোনো কর্মীর পারফরমেন্স কেমন তা প্রধান কার্যালয় থেকেই জানা যায়। সে অনুযায়ী তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। আগে ম্যানুয়ালি চিঠি চালাচালি করতে হতো, এখন তার প্রয়োজন হয় না। দ্রুত ইনফরমেশন পাচ্ছি। এসব বিষয় সংস্থার কার্যক্রমকে গতিশীল করছে। সব পর্যায়ে কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

আমি মনে করি দেশে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশও উন্নত হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বুরো বাংলাদেশের ডিজিটালাইজেশন বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের বেসরকারি উন্নয়ন খাতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি ডিজিটালাইজড হয় তবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই এর সুযোগ-সুবিধা পাবে, তাদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম সহজ হয়ে আসবে। ■

● প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশেষ কর্মসূচি
বুরো বাংলাদেশ

প্রাণেশ চন্দ্র বণিক

বুরোর ডিজিটাল যাত্রা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ

বিশ্বের অভিযাত্রায় প্রতিনিয়তই যুগের প্রয়োজনে আধুনিকায়ন ঘটে। বর্তমান সময়ে যুগের দাবি হচ্ছে ডিজিটালাইজেশন। ব্যক্তি থেকে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য এটি অবশ্যই অপরিহার্য। এখন আর ডিজিটালাইজেশন কোনো আঞ্চলিক বিষয় নয়, যেকোনো কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এটি চিন্তাকে যেমন সহজ করে দেয়, তেমনি কাজগুলোও সহজ করে দেয়। বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি কার্যক্রমসহ এসবের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রকে সহজ করে।

একটা কথা প্রবাদ বাক্যের মতো যে, মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। ফলে ম্যানুয়ালি কোনো কাজ করলে সেখানে কোনো ভুল হলে তা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু ডিজিটাল সিস্টেমে ভুলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে ডিজিটাল সিস্টেমে ত্রুটিমুক্ত কাজ পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা'র চালু হয়েছে, এটিও কিন্তু ডিজিটালাইজেশনের ফসল। এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তার কার্যক্রম দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেবে। এ দেশে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে এটি চালুও হয়েছে।

বুরো বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশনের যাত্রা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে এখানে কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ অডিটের ক্ষেত্রে নিজস্ব সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। এটি দ্রুতই বাস্তবায়ন হবে। এর ফলে বুরো বাংলাদেশ এক উচ্চমাত্রায় প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। আগে যখন ম্যানুয়ালি বার্ষিক রিপোর্ট তৈরি করা হতো তখন গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা বেশ কঠিন হতো, এখন ডিজিটালাইজেশনের ফলে তা ভালোভাবে সংযোজন করা সম্ভব হচ্ছে। কাজের গতি অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ জন্য দক্ষতার উন্নয়নে আমাদের আইটি ডিভিশন কর্মীদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজ গতিশীল হচ্ছে। মাইক্রো ফাইন্যান্স সেক্টরে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখানকার কর্মীরা এখন বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। সরকার ইতিমধ্যে এই সেক্টরের সহায়তার জন্য মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমআরএ ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের জন্যও 'সিআইবি' করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এর ফলে যেকোনো গ্রাহকের ঋণের ঝুঁকি নির্ধারণ করা সহজ হবে। ব্যাংকের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রেও এটি ভালো ফল দেবে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের থেকে কতজন একাধিক প্রতিষ্ঠানের কত টাকা ঋণ নিয়েছেন সেটাও জানা সম্ভব হবে। 'গ্লোবাল ভিলেজ' এখন ডিজিটালাইজেশনের জন্যই মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে। এমনকি যেকোনো দুর্যোগের আগে সতর্ক বাণী দিয়ে সতর্ক করা সম্ভব হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এই পদ্ধতিতে বুরো বাংলাদেশের গ্রাহকরা বেশ প্রশান্তি অনুভব করছেন এবং দ্রুততার সাথে তাদের লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মীরা তাদের নিজেদের ছুটিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সিলভিয়াতে দেখতে পাচ্ছেন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত জানতে পারছেন।

সর্বোপরি ডিজিটালাইজেশনের ফলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ায় বিদেশি দাতা সংস্থাসহ সাধারণ গ্রাহকরাও প্রতিষ্ঠানের প্রতি অধিক আস্থাশীল থাকবেন। ■

● পরিচালক, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
বুরো বাংলাদেশ

ফরিদার প্রাণময় হয়ে ওঠার গল্প

গৃহকর্মীর কাজ করে জীবন নির্বাহ করেন ফরিদা বেগম। স্বামী-সন্তানহীন দুস্থ এই নারী বাস করেন টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। শারীরিক জটিলতার মধ্যে ছিল জ্বর, ফোলা রোগ বা শোথ, গুরুতর দুর্বলতা, মূত্রনালীর সংক্রমণসহ অন্যান্য জটিলতা। আর্থিক টানাপড়েন যার নিত্যসঙ্গী, খাবারের অভাবে যাকে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শহরের হাসপাতালে হাজার টাকা খরচ করে ডাক্তার দেখানোর সক্ষমতা তার কখনোই ছিল না। ফলস্বরূপ, রোগ-তাপে কোনোমতে দিন যাপন করছিলেন তিনি।

ফরিদার আত্মীয়-স্বজন বা কাছের কেউ বলতে পৃথিবীতে বেশি মানুষ নেই। থাকার মধ্যে আছে একজন ছোট বোন। ফরিদার ছোট বোন বুরো বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির একজন সদস্য। তিনিও বোনের শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। এক দিন তিনি ঋণসংক্রান্ত কাজে বুরোর শাখা অফিসে গেলে 'বুরো কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টার' সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি শাখায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন; এই হেলথকেয়ার সেন্টারে একটি পরিবারের কেউ সদস্য হিসেবে নিবন্ধন করলে সেই পরিবার থেকে ৪ জন সদস্য সারা বছর ধরে বিনামূল্যে ১১টি রোগের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, টেলিমেডিসিন সেবা ও এমবিবিএস ডাক্তারের কনসাল্টেশন পেয়ে থাকেন। এছাড়াও কোনো সদস্য চাইলে হ্রাসকৃত সাশ্রয়ী মূল্যে ২৯টি রোগ নির্ণয়সেবা ও ডাক্তারের পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

ফরিদা যখন ছোট বোনের থেকে জানতে পারলেন যে, মাত্র একশ টাকা দিয়ে বুরো কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টারের সদস্য হওয়া যায়, ফরিদা যেন তখন আশায় বুক বাঁধলেন এবং ঘাটাইলে অবস্থিত বুরো কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টারে গিয়ে সদস্য হিসেবে নিবন্ধন করলেন।

পরবর্তীতে সেন্টারের মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট তার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করেন এবং একজন এমবিবিএস ডাক্তারের সঙ্গে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে কথা বলিয়ে দেন। ডাক্তার তার বর্তমান অবস্থা বোঝার জন্য কিছু পরীক্ষার পরামর্শ দেন।

পরীক্ষার ফলাফল দেখে মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ফরিদাকে তাৎক্ষণিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণের পরামর্শ দেন। প্রতি মাসে ডাক্তারের কাছে যাওয়া, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার গাইডলাইন যথাযথভাবে মেনে চলা শুরু করেন। হেলথকেয়ার সেন্টারের মেডিকেল টিম ফরিদার নিয়মিত খোঁজ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে থাকে। ফলস্বরূপ ফরিদা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা শুরু করেন।

কয়েক সপ্তাহ পর ফরিদা আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান। এবার তিনি বুঝতে পারলেন তিনি সুস্থ জীবনের দিকে পা বাড়াচ্ছেন।

ফরিদা এখন আর স্বাস্থ্য সমস্যাকে অন্ধভাবে উপেক্ষা করছেন না। ফরিদা এ ধরনের যত্ন মানুষের থেকে পেয়ে অভ্যস্ত নন। ঘাটাইল বুরো কমিউনিটি হেলথকেয়ার সেন্টারের মেডিকেল টিম যেভাবে যত্নের সাথে ফরিদার নিয়মিত খোঁজ রেখেছেন ও পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে ধীরে ধীরে তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভালো বোধ করা শুরু করেন। তার কথায়, 'বুরো হেলথকেয়ার সেন্টার আমার মতো একজন দরিদ্র নারীকে আমার সক্ষমতার মধ্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে সহায়তা করেছে। আমাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সমস্যার এমন একটি সমাধান পেয়েছি, যা আমাকে আবার প্রাণময় করে তুলেছে। বুরো বাংলাদেশের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।' ■

"বুরো হেলথকেয়ার সেন্টার আমার মতো একজন দরিদ্র নারীকে আমার সক্ষমতার মধ্যে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে সহায়তা করেছে। আমাদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সমস্যার এমন একটি সমাধান পেয়েছি, যা আমাকে আবার প্রাণময় করে তুলেছে। বুরো বাংলাদেশের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।"

মনীষা সেতু হাজং
● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

বুরো বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রা

ফারমিনা হোসেন

ফারমিনা হোসেন, বুরো বাংলাদেশের পরিচালক অপারেশনস, ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এইচআরডি এবং আইসিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বাংলাদেশের এনজিও এবং মাইক্রোফাইন্যান্স সেক্টরে তরুণ নেতৃত্ব হিসেবে তিনি ইতিমধ্যেই স্থান করে নিয়েছেন। বুরো বাংলাদেশসহ এই সেক্টরে আধুনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বুরো বাংলাদেশকে একটি প্রযুক্তিনির্ভর সংস্থায় পরিণত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। ফারমিনা হোসেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

পরিচালক অপারেশনস হিসেবে গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা এবং অপারেশনাল স্থিতিশীলতা টেকসই করতে ফারমিনা হোসেনের ভূমিকা ইতিমধ্যেই আশানুরূপ ফলাফল বয়ে এনেছে। তার বিশ্বাস, প্রযুক্তি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি মাইক্রোফাইন্যান্সে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ব্যবহার করার পক্ষে জোরালো ভূমিকা পালন করছেন। তার নির্দেশনায় বুরোর সব শাখা বর্তমানে ডিজিটাল শাখায় রূপান্তরিত হয়েছে। দক্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও ফারমিনা হোসেন বুরোর কর্মীদের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং তাদের দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিবর্তন ব্যতীত অগ্রগতি অসম্ভব– বলেছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সফল প্রযুক্তিবিদ ও প্রথম অ্যানিমেশন প্রোগ্রামার ওয়াল্ট ডিজনি। আমরা সেই পরিবর্তনের পথেই হাঁটছি। গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ডিজিটালাইজেশনের ব্যাপক গতি বৃদ্ধির কারণে সারা বিশ্বে জীবন-জীবিকা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। কানেক্টিভিটি এবং স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার সহজ হওয়ার কারণে বাংলাদেশও ডিজিটাইজেশনে সহজে সম্পৃক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপরেখা ও উদ্যোগ এই সম্পৃক্ততাকে দ্রুত করেছে।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বুরো বাংলাদেশ একটি উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারিদ্র্য নিরসনসহ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিগত তিন দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে সংস্থার ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার প্রায় সব গ্রাহককে ভেরিফায়েড ডিজিটাল পেমেন্ট পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দেশজুড়ে প্রায় ১৩০০ এর বেশি শাখার মাধ্যমে ২৫ লক্ষ গ্রাহকের স্বপ্ন, লক্ষ্য এবং উন্নত জীবনের চাহিদা উপলব্ধি করতে বুরো বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে। আর সেই উপলব্ধি থেকেই দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে বুরো বাংলাদেশ গ্রাহকদের চাহিদা, পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো যেন সবার

> **"বুরো বাংলাদেশের সব শাখায় ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ডিএফএস প্রোগ্রামের উন্নয়ন হওয়ায় ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত কোভিড প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণ সংস্থার জন্য সহজতর হয়েছে।**

জন্য কার্যকরী এবং টেকসই হয় সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। যখন পরিবর্তনই একমাত্র সত্য, তখন যেকোনো পরিবর্তনকে কার্যকর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য দৃঢ় মনোভাব প্রয়োজন। অদূর ভবিষ্যতে সব আর্থিক লেনদেন ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন হবে- এই উপলব্ধি থেকেই বুরো বাংলাদেশ সব শাখার কার্যক্রমকে অটোমেশন ও রিয়েলটাইম কানেক্টিভিটির আওতায় যুক্ত করার একটি কারিগরি ও কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এখানে বলা প্রয়োজন, ২০১৭ সালে তিনটি শাখায় সফল পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ২০১৯ সালে বুরো বাংলাদেশের সব শাখার যাবতীয় নথি সংরক্ষণ, লেনদেন এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমকে ডিজিটাল কাঠামোতে রূপান্তর করার প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। ফলে সব শাখাই এখন সম্পূর্ণ ডিজিটাল এবং রিয়েলটাইম অনলাইন মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২০ সালে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IMS) এবং ফিক্সড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (FAMS) সঙ্গে শাখা পরিচালনার নিয়মিত কার্যক্রম একীভূত করার মাধ্যমে সংস্থার পুরো সিস্টেমকে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা বুরো বাংলাদেশের এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং প্ল্যাটফর্মে (ERP) রূপান্তরিত হবে। এই প্ল্যাটফর্মে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা এবং ক্রয়বিষয়ক কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বুরো বাংলাদেশের কর্মীদের ডিজিটালি আরও দক্ষ করে তুলতে ঋণ ও সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য সব কর্মসূচি সংগঠককে ৯ হাজারেরও বেশি ডেটা সিম ও KNOX নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সক্ষম Samsung Tablet সরবরাহ করা হয়েছে। Google Chrome, Adobe Reader, gBanker+, Gmail, Gallery, Camera, Knox Manage remote, মোবাইল ফোন এবং Google Map ট্র্যাকিং ব্যবহারের মাধ্যমে

KNOX ফিচারকে কাজে লাগিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ডিভাইস হারালে তাৎক্ষণিক ব্লক করা, অফিসের কাজের সময় ইউটিউব, ফেসবুকের মতো ডোমেন ব্লক রাখা এবং ব্যবহারকারীর কাছ থেকে ফ্যাক্টরি রিসেট সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এখন নিরাপদে ডিজিটাল এবং মোবাইল পদ্ধতিতে রিয়েলটাইমে তাদের পোর্টফোলিও স্ট্যাটাস ট্র্যাক, ইনপুট প্রদান এবং আপডেট করতে পারছে। মোবাইল আর্থিক পরিষেবাগুলোর (MFS) ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সংস্থার ডিজিটাল রূপান্তরের পরবর্তী মাইলফলক ছিল গ্রাহকদের জন্য একটি ভেরিফায়েড ডিজিটাল পেমেন্ট সল্যুশন তৈরি করা। এতে গ্রাহকরা যেকোনো সময়, যেকোনো স্থান থেকে সর্বোচ্চ কম খরচে নিজেদের ফোনের মাধ্যমে সহজে লেনদেন করতে সক্ষম হয়।
বুরো বাংলাদেশের কর্মসূচি বিভাগ ও আইসিটি টিম টেকনিক্যাল সার্ভিস প্রোভাইডার এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে নিয়ে একটি End-to-end plug & play system প্রণয়ন করছে, যা অন্যান্য এমএফআইও তাদের সুবিধার্থে ব্যবহারের সুযোগ পাবে।
বুরো বাংলাদেশের এই উদ্ভাবন শুধু সংস্থার গ্রাহকদের সমস্যা সমাধানের জন্যই নয়, বরং পুরো এমএফআই সেক্টরকে সহায়তা করার জন্য। এর ফলে এমএফআই খাতের ডিজিটাল উন্নয়ন দ্বারা দেশ এবং জনগণের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন দ্রুতগতি লাভ করবে।
২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে সংস্থার দুটি শাখায় ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রকল্পের একটি পাইলট কর্মসূচি শুরু করে।
পরবর্তীতে এই প্রকল্পের আওতায় গত ৫ বছরে প্রায় ১০ হাজার জন প্রশিক্ষিত কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ৪০০টি লেনদেন দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে এই সংখ্যা মাসে কয়েক লক্ষ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিজিটাল লেনদেনের সংখ্যা ২.০৯ কোটির বেশি ছাড়িয়ে গেছে যা প্রতি বছরান্তে ৪৩.৫৪% এর বেশি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে ১.৫০ লক্ষ সদস্য ডিজিটাল মাধ্যমে প্রায় ১০০ কোটি টাকা সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান করেন।
গত ২০২৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৬ লক্ষ সদস্য এক বা একাধিকবার ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করে ২৭৫৮ কোটিরও বেশি টাকা সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি প্রদান করেন। প্রতি বছরান্তে প্রায় ৩৩.১১% হারে ডিজিটাল লেনদেনকৃত টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠানের মোট লেনদেনকৃত টাকার প্রায় ১০% লেনদেন ডিএফএস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।
বুরো বাংলাদেশের সব শাখায় ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ডিএফএস প্রোগ্রামের উন্নয়ন হওয়ায় ২০২০ সালে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত কোভিড প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণ সংস্থার জন্য সহজতর হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংস্থার ৩৯ হাজার ৫৫২ জন সদস্যের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ২৭০ কোটি টাকা সফলভাবে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি বুরো বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের বেতন বাবদ প্রায় ৫০ কোটি টাকাও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।
ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের সুবিধাগুলো প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সৃষ্টির পাশাপাশি এই সক্ষমতাকে বহুগুণে প্রসারিত করেছে। যার ফলে অন্যান্য অনেক লেনদেনও এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রাহকদের জন্য ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত রাখার পাশাপাশি এতে গ্রাহকদের লেনদেনের সময় এবং যাতায়াত খরচের সাশ্রয় হয়। গ্রাহক যেকোনো সময় যেকোনো স্থান থেকে বিনা খরচে তার সাধারণ অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, মেয়াদি সঞ্চয় ব্যালেন্স, ঋণের কিস্তি ও বকেয়ার পরিমাণও দেখতে পারে। ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে সংস্থা ইতিমধ্যে সব ডিএফএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ পর্যন্ত কয়েকবার লেনদেনের খরচ কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেখানে নিয়মিত লেনদেনের ক্ষেত্রে ১০০০ টাকায় ১৮.৫০ টাকা খরচ হয়, সেখানে বুরো বাংলাদেশের সদস্যগণের লেনদেনের ক্ষেত্রে শুরুতে ১০০০ টাকায় মাত্র ১০ টাকা খরচ হতো, যা নিয়মিত খরচের প্রায় ৫০% কম।
পরবর্তীতে এই খরচ আরও কমিয়ে ৯.২০ টাকা এবং ৯ টাকা করা হয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, লেনদেনের ক্ষেত্রে এই খরচ সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা। অর্থাৎ গ্রাহক যদি একটি ধাপে বড় অঙ্কের কোনো লেনদেন করেন, তখন তার জন্য এই খরচের পরিমাণ ১৫০ টাকার বেশি হবে না। এছাড়াও ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে সদস্যরা ঘরে বসেই মোবাইল রিচার্জ, সেন্ড মানি, অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন রকম ডিজিটাল সুযোগ পাচ্ছেন যা কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণেও ভূমিকা রেখেছে। ■

● পরিচালক অপারেশনস– ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এইচআরডি ও আইসিটি, বুরো বাংলাদেশ

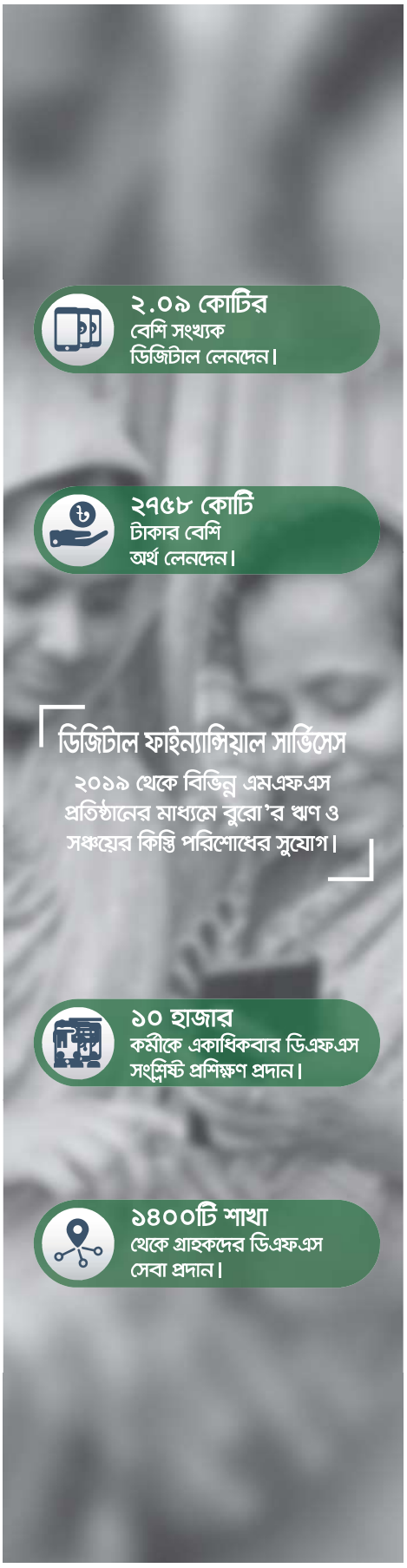

বুরো বাংলাদেশ বিগত তিন দশক ধরে সদস্যদের যুগোপযোগী ও টেকসই উন্নয়ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও পয়োনিষ্কাশন, কৃষি, ব্যবসায় উদ্যোগ, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা খাতে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা বুরোকে দেশের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। ১৯৯০ সালে দারিদ্র্য বিমোচনের স্বপ্ন নিয়ে ৭৯ জন কর্মী, ৫৫ হাজার টাকা এবং টাঙ্গাইলে মাত্র ৫টি শাখা দিয়ে বুরো বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে দেশজুড়ে প্রায় ১৪০০টি শাখার ২৬ লক্ষ সদস্যের সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গড়ার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বুরোর ১০ হাজারের বেশি কর্মী কাজ করে চলেছে। নতুন কোনো কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করা কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সদস্যদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া সব ক্ষেত্রে মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মীবাহিনী সাধারণ মানুষের কাছে বুরোর প্রতিনিধিত্ব করছেন। বুরো বাংলাদেশ শুরু থেকে এই কর্মীবাহিনীর জন্য উত্তম কর্মপরিবেশ নিশ্চিত এবং দক্ষতা উন্নয়নে মনোযোগী ছিল, যা আজও বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায় সংস্থার সব শাখা, এলাকা, অঞ্চল ও বিভাগীয় ব্যবস্থাপক এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে আঞ্চলিক ও বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি সংক্রান্ত বার্ষিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। ২০২৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তিন মাসব্যাপী এ আয়োজনে দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে ৩৮টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার কাজের পরিধি, ধরনে পরিবর্তন ও ডিজিটালাইজেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে কর্মক্ষেত্রে কর্মীদের যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয়, সেগুলো উপস্থাপনের পাশাপাশি সমাধানের উদ্দেশ্যে সভায় কর্মীদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগটি কর্মীদের সমস্যা ও পরামর্শ উঠে আসার একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে।

ঢাকা বিভাগ

বিভাগ : ঢাকা। তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৬ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ৪৫ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : সাভার
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা, ১১ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫২ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: মিজানুর রহমান।

অঞ্চল : গাজীপুর
তারিখ : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা, ১০ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৯ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ১ জন WaSH এবং ১ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবু সায়েম।

অঞ্চল : নারায়ণগঞ্জ
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক টুটুল চন্দ্র পাল।

অঞ্চল : মুন্সীগঞ্জ
তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা, ৬ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ২৯ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: আফরোজ মিয়া।

অঞ্চল : ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ
তারিখ : ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : প্রধান কার্যালয়

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মুস্তাফিজুর রহমান রাহাত, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ঢাকা, ১১ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৬২ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ৩ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা উত্তরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: রফিকুল ইসলাম এবং দক্ষিণের শাহজাহান আলী।

রংপুর বিভাগ

বিভাগ : রংপুর। তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, বগুড়া

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো: সাইদুর রহমান রিপন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ৩৪ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : ঠাকুরগাঁও
তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : বিএলসি, দিনাজপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: সাইদুর রহমান রিপন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রংপুর, ১১ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫৬ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: আরিচ হোসেন।

অঞ্চল : রংপুর
তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : বিএলসি, রংপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: সাইদুর রহমান রিপন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রংপুর, ১৩ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৬৬ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: বাহাদুর আলম।

অঞ্চল : বগুড়া
তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: সাইদুর রহমান রিপন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রংপুর, ১০ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫০ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: মোতাহারুল ইসলাম।

খুলনা বিভাগ

বিভাগ : খুলনা। তারিখ : ১ মার্চ, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, খুলনা

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক খুলনা ইস্তাক আহাম্মেদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ২৪ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : খুলনা
তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, খুলনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্তাক আহাম্মেদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, খুলনা, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪১ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: ইকবাল হায়দার।

অঞ্চল : যশোর
তারিখ : ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, খুলনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্তাক আহাম্মেদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, খুলনা, ৮ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪২ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আল-আমীন খান।

বরিশাল বিভাগ

বিভাগ : বরিশাল। তারিখ : ৫ মার্চ, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, ফরিদপুর

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক বরিশাল মো: রফিকুল ইসলাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ২৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : কুষ্টিয়া
তারিখ : ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, খুলনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন ইস্তাক আহাম্মেদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, খুলনা, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৬ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খন্দকার মাহবুবুর রহমান।

অঞ্চল : ফরিদপুর
তারিখ : ২ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, ফরিদপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: রফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, বরিশাল, ৮ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪১ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: আলমগীর কবির।

অঞ্চল : মাদারীপুর
তারিখ : ৩ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, ফরিদপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: রফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, বরিশাল, ১১ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫১ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল বাশার মিয়া।

অঞ্চল : বরিশাল
তারিখ : ৪ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, ফরিদপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: রফিকুল ইসলাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, বরিশাল, ১০ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: জিয়াউল সিদ্দিকী।

চট্টগ্রাম বিভাগ

বিভাগ : চট্টগ্রাম। তারিখ : ১৬ মার্চ, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, চট্টগ্রাম

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক চট্টগ্রাম মো: আব্দুস সালাম। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৫ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ২৮ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : ফেনী
তারিখ : ১২ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুস সালাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম, ৫ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৮ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: রেজাউল করিম চৌধুরী।

অঞ্চল : নোয়াখালী
তারিখ : ১৩ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুস সালাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৭ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এবিএম আলাউদ্দিন আহমেদ।

অঞ্চল : চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ
তারিখ : ১৪ মার্চ, ২০২৩
স্থান : হোটেল পেনিনসুলা, চট্টগ্রাম

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুস সালাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম, ১৩ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৬৯ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। যৌথভাবে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম উত্তরের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উত্তম কুমার বসাক ও দক্ষিণের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক শেখ মো: জহিরুল কবির।

অঞ্চল : কক্সবাজার
তারিখ : ১৫ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, চট্টগ্রাম

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: আব্দুস সালাম, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম, ৪ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩০ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক বাবুল কুমার সাহা।

কুমিল্লা বিভাগ

বিভাগ : কুমিল্লা। তারিখ : ৩১ মার্চ, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক কুমিল্লা মীর মুকুল হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ৩৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : চাঁদপুর
তারিখ : ২৭ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মীর মুকুল হোসেন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৭ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ শাহাদত হোসেন।

অঞ্চল : ব্রাহ্মণবাড়িয়া
তারিখ : ২৮ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মীর মুকুল হোসেন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৭ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আশানূল হাসান।

অঞ্চল : কুমিল্লা
তারিখ : ২৯ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মীর মুকুল হোসেন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা, ১০ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫৬ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: মহসিন মিয়া।

অঞ্চল : সিলেট
তারিখ : ৩০ মার্চ, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, কুমিল্লা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মীর মুকুল হোসেন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, কুমিল্লা, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৯ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক খন্দকার মিজানুর রহমান।

ময়মনসিংহ বিভাগ

বিভাগ : ময়মনসিংহ। তারিখ : ৬ এপ্রিল, ২০২৩। স্থান : বুরো সিএইচআরডি, মধুপুর

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো: হারুন অর রশিদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ৩১ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, একজন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : সখীপুর
তারিখ : ২ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, টাঙ্গাইল

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: হারুন অর রশিদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫৩ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: মোশাররফ হোসেন।

অঞ্চল : টাঙ্গাইল
তারিখ : ৩ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, টাঙ্গাইল

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: হারুন অর রশিদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ, ৮ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫৮ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সামছুল আলম।

অঞ্চল : মধুপুর
তারিখ : ৪ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, মধুপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: হারুন অর রশিদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৭ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ৩ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: জহিরুল ইসলাম।

অঞ্চল : ময়মনসিংহ
তারিখ : ৫ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বুরো সিএইচআরডি, মধুপুর

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: হারুন অর রশিদ, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ, ৯ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৪৭ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: আওলাদ হোসেন।

রাজশাহী বিভাগ

বিভাগ : রাজশাহী। তারিখ : ১৩ এপ্রিল, ২০২৩। স্থান : আশ্রয়, রাজশাহী

সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক মো: মহসীন হোসেন খাঁন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ৪ জন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, ৩৮ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, একজন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, একজন SMAP কর্মী, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।

অঞ্চল : সিরাজগঞ্জ
তারিখ : ৯ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বিএলসি, পাবনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মহসীন হোসেন খাঁন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রাজশাহী, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৯ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী। সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবুল হোসেন মিঞা।

অঞ্চল : পাবনা
তারিখ : ১০ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : বিএলসি, পাবনা

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মহসীন হোসেন খাঁন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রাজশাহী, ৬ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৫ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ১ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: রিয়াজ উদ্দিন।

অঞ্চল : রাজশাহী
তারিখ : ১১ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : আশ্রয়, রাজশাহী

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মহসীন হোসেন খাঁন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রাজশাহী, ৭ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৩৮ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো: আবু সাঈদ সিকদার।

অঞ্চল : নওগাঁ
তারিখ : ১২ এপ্রিল, ২০২৩
স্থান : আশ্রয়, রাজশাহী

সভায় উপস্থিত ছিলেন মো: মহসীন হোসেন খাঁন, বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, রাজশাহী, ১০ জন এলাকা ব্যবস্থাপক, ৫১ জন শাখা ব্যবস্থাপক, ২ জন ব্যবস্থাপক-কর্মসূচি, ২ জন WaSH এবং ২ জন DFS কর্মী।
সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আবু সাইদ।

রংপুরে এক বছরে চার ফসলের আবাদ

আমিনুর রহমান একজন কৃষক। ১৭৫ শতক জমিতে তিনি বছরের বিভিন্ন সময় ধান ও শাকসবজি চাষ করে থাকেন। এক জমিতে এক বছরে পর্যায়ক্রমে চারবার ফসল আবাদ করতে পেরে বেশ খুশি তিনি। এবার তিনি ১২৫ শতক জমিতে সবজির আবাদ করেছেন, এর মধ্যে ৫৫ শতক জমিতে সরিষা, ২৫ শতক জমিতে শিম-বরবটি, ৩৫ শতক জমিতে আলু ও ৬০ শতক জমিতে ধান চাষ করেছেন। এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় ঋতুভেদে করলা, বেগুন, লাউ, শসা, ফুলকপি, ভুট্টাসহ নানা ফসল মিশ্র পদ্ধতিতে চাষ করে থাকেন তিনি। তিনি জানালেন, আগে বছরে দুটি ফসল করতাম। ফসল বিক্রি করে যা পেতাম, তা ওইখানেই (ফসল চাষে) খরচ হয়ে যেত। মহাজন থেকে ধার করে আবাদ করতাম, সবজি বিক্রি করে যা পেতাম, পুরোটাই তাকে দিয়ে দিতে হতো।

আমিনুর রহমানের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুরে। স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে আমিনুরের পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে কৃষিকাজের সাথে যুক্ত থাকলেও উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে আমিনুরের ধারণা ছিল না। তাছাড়া দিন দিন তার জমিতে ফসলের উৎপাদন কমে আসছিল। প্রায়শই বন্যা-খরায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, পোকায় ধরা, ফলন কম হওয়াসহ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিলেন।

প্রায় বছরখানেক আগে আমিনুর রহমানের সাথে পরিচয় হয় বুরো বাংলাদেশের এসএমএপি প্রকল্পের কর্মী মিজানুরের সাথে। মিজানুরের কাছ থেকে জানতে পারেন, বুরো বাংলাদেশের এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের কৃষিঋণ বিতরণের পাশাপাশি উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এতে আমিনুর রহমান আগ্রহ নিয়ে বুরো বাংলাদেশের মিঠাপুকুর শাখার সদস্য হলে বুরো বাংলাদেশের এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় তিনিসহ তার এলাকার ২০ জন কৃষক উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। এতদিন এলোপাতাড়িভাবে তিনি সবজির চারা বপন এবং উচ্চ ফলনের আশায় বিভিন্ন কৃত্রিম কীটনাশক সার ব্যবহার করে আসছিলেন। এবার তিনি সফলভাবে প্রশিক্ষণের জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন মাঠে। জমিতে সঠিক নিয়মে মাটি ভরাট করে বেড বানিয়ে শিম-বরবটির বীজ বুনেছেন। ফলে সহজেই ক্ষেত পরিষ্কার করতে পারছেন, আগাছা জন্মাচ্ছে না। রোগজীবাণুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঘরে তৈরি জৈব সার ব্যবহার করছেন। এতে উৎপাদন খরচও কমে গেছে। এ বছর সবজি চাষের জন্য তিনি বুরো বাংলাদেশ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ফলন ভালো হওয়ায় প্রতি সপ্তাহে সবজি বিক্রি করা টাকায় কিস্তি পরিশোধ করার পর হাতে কিছু টাকা জমেছে বলে জানান তিনি।

তিনি জানিয়েছেন, এসএমএপি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন এসএমএপি প্রকল্পের কর্মীদের কাছ থেকে। প্রতি মাসে ২-৩ বার ফসলের মাঠ পর্যবেক্ষণ ও তার খোঁজখবর নিতে আসেন এসএমএপি প্রকল্পের কর্মীরা। এ সময় প্রয়োজনমাফিক কারিগরি পরামর্শ দিয়ে থাকেন তারা। ফসলের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাদের জানানো মাত্র চলে আসেন প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে। এছাড়া কর্মীদের কাছে ঘরে বসে প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে জৈব সার তৈরি ও বীজ সংরক্ষণ করা শিখেছেন তিনি।

কর্মীদের নিয়ে আমিনুর বলেন, তাদের ব্যবহার খুবই ভালো। তারা যা পরামর্শ দেয়, তা অনেক ভালো, কার্যকর। আমি তাদের পরামর্শ মতো চাষবাস করছি। আলহামদুলিল্লাহ, এ পর্যন্ত খুবই ভালো ফল পাচ্ছি। আগেরবার শিম-বরবটি লাগিয়ে যা পেয়েছি এবার তার দেড়গুণ পাব।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাইকার সহযোগিতায় বুরো বাংলাদেশের এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশজুড়ে এ পর্যন্ত এক লক্ষেরও বেশি কৃষককে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে কৃষিঋণ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। কৃষি সম্পর্কিত তথ্য কৃষকদের জানাতে বিশ হাজারের বেশি কৃষককে যুক্ত করা হয়েছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। ■

“এসএমএপি প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন এসএমএপি প্রকল্পের কর্মীদের কাছ থেকে। প্রতি মাসে ২-৩ বার ফসলের মাঠ পর্যবেক্ষণ ও তার খোঁজখবর নিতে আসেন এসএমএপি প্রকল্পের কর্মীরা। এ সময় প্রয়োজনমাফিক কারিগরি পরামর্শ দিয়ে থাকেন তারা। ফসলের কোনো সমস্যা দেখা দিলে তাদের জানানো মাত্র চলে আসেন প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে।”

মনীষা সেতু হাজং
● ব্যবস্থাপক, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন

বুরো বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বুরো বাংলাদেশের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গভর্নিং বডির চেয়ারপার্সন জনাব ড. এম এ ইউসুফ খানের সভাপতিত্বে সংস্থার গুলশান-২-এর প্রধান কার্যালয়ে এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাইস চেয়ারপার্সন ডা. সাঈদা খান আলম, অর্থ সচিব রফিকুল ইসলাম এবং সদস্য সচিব ও সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেনসহ সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে সদস্যবৃন্দকে সংস্থার পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সাধারণ সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ হলেন– ড. মাহবুব সাদিক, মাহবুবা হাসানাত, আবদুল লতিফ খান, কাজী মোহাম্মদ শোয়েব, সুখেন্দ্র কুমার সরকার, আলতাফ হোসেন, খন্দকার রাবেয়া আনোয়ার, ড. রওশন আরা ফিরোজ, সৈয়দ শাহাদত হোসেন, খন্দকার মাহফুজুর রহমান, শাহ আলম খান, আবু ফয়সাল মো. নুরুল আমীন, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মির্জা কামরুন নাহার ও ড. ফাতেমা জোহরা বেগম। সভায় আরও অংশগ্রহণ করেন সংস্থার পরিচালক- অর্থ এম মোশাররফ হোসেন, পরিচালক- বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা- প্রাণেশ চন্দ্র বণিক ও পরিচালক অপারেশনস- ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, এইচআরডি ও আইসিটি।

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ড. এম এ ইউসুফ খান
চেয়ারপার্সন, গভর্নিং বডি
সাবেক ব্যাংকার, লেখক, গবেষক ও সংগঠক

ডা. সাঈদা খান আলম
ভাইস চেয়ারপার্সন, গভর্নিং বডি
চেয়ারপার্সন, বুরো হেলথকেয়ার ফাউন্ডেশন
গাইনোকোলজিস্ট ও ব্রেস্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ

মো. রফিকুল ইসলাম
অর্থ সচিব, গভর্নিং বডি
ব্যবস্থাপনা ও বিপণন বিশেষজ্ঞ

ড. মো: নুরুল আমিন খান (মাহবুব সাদিক)
সদস্য, গভর্নিং বডি
সাবেক অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ এবং
বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি ও প্রাবন্ধিক

মাহবুবা হাসানাত
সদস্য, গভর্নিং বডি
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

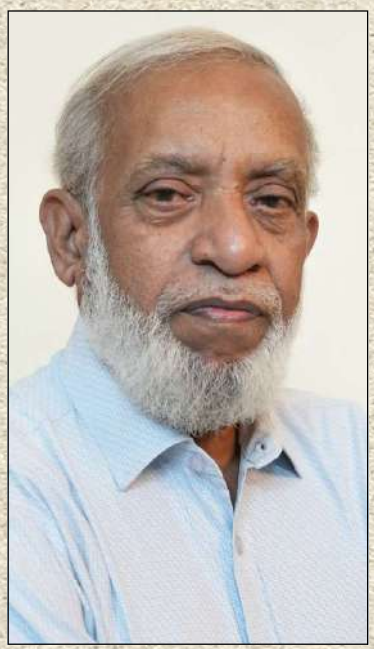

আবদুল লতিফ খান
সদস্য, গভর্নিং বডি
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

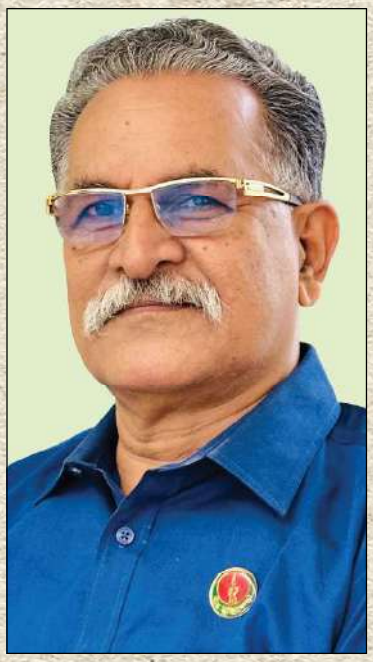

ব্যুরো বাংলাদেশের সাধারণ পরিষদ সদস্যবৃন্দের পরিচিতি

কাজী মোহাম্মদ শোয়েব
সদস্য, গভর্নিং বডি
বীর মুক্তিযোদ্ধা, সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী

সুখেন্দ্র কুমার সরকার
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
সাবেক ট্রেজারার, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক পরিচালক, ব্র্যাক

আলতাফ হোসেন
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব

খন্দকার রাবেয়া আনোয়ার
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
শিক্ষক ও সমাজসেবী

ড. রওশন আরা ফিরোজ
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
শিক্ষাবিদ ও সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ সাহাদত হোসেন
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
বীমা বিশেষজ্ঞ

শাহ্ আলম খান
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
ব্যবসায়ী, সমাজসেবী ও মানবাধিকার কর্মী

আবু ফয়সাল মো: নুরুল আমীন
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
অবসরপ্রাপ্ত মেজর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

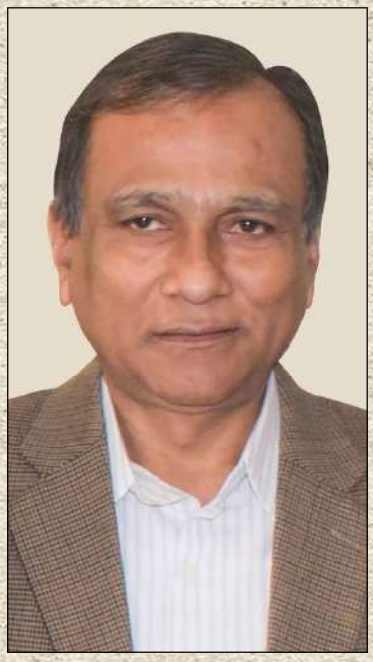

খঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
ক্ষুদ্র অর্থায়ন নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ

ড. ফাতেমা জোহরা বেগম
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
অধ্যাপক, লেখক ও সংগঠক

মির্জা কামরুন নাহার
সদস্য, সাধারণ পরিষদ
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে টাঙ্গাইলের ছিলিমপুরে বুরো বাংলাদেশের 'মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র-টাঙ্গাইল'-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। বৃক্ষরোপণ, ফলক উন্মোচন এবং ফেস্টুন ও পায়রা উড়িয়ে বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন ও অন্য দুই প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এম মোশাররফ হোসেন ও মো. সিরাজুল ইসলাম যৌথভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন।

এই আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে সংস্থার সব পরিচালক, সহকারী পরিচালক ও তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ, সব বিভাগীয় ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ের শতাধিক কর্মী এবং টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিত ছিলেন। দুই দিনব্যাপী এই আয়োজনে 'ফিরে দেখা: বুরো টাঙ্গাইল থেকে বুরো বাংলাদেশ' শিরোনামে দুই পর্বের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালীন ১৯ জন কর্মীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শুভ উদ্বোধনকে আনন্দময় করতে আগের সন্ধ্যায় আতশবাজি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত বিশ্বমানের এই মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রটি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও গবেষণামূলক উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করার কথা জানানো হয়। দেশের জন্য উপযুক্ত মানবসম্পদ গড়ে তুলতে যথার্থ ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে এটি বুরো বাংলাদেশের একটি উন্নয়ন প্রয়াস।

শুভ উদ্বোধন সিএইচআরডি, টাঙ্গাইল

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন বলেন, 'আমাদের কর্মীরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে প্রতিদিনই প্রত্যন্ত অঞ্চলের সদস্যদের সেবা দেওয়ার জন্য যাচ্ছে। তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সদস্যদের সার্ভিস চার্জের কন্ট্রিবিউশন দিয়ে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে গণমানুষ, এনজিও ও কর্পোরেটদের জন্য এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণ করতে পেরেছি।'

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন মানবসম্পদ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'দেশ ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করব- এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। দারিদ্র্যের বহুমুখী রূপ আছে। এই রূপকে অতিক্রম করতে গেলে, যারা তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সেই কর্মী বাহিনীর ধারাবাহিকভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ জন্যই বুরো বাংলাদেশ মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে। শুধু বুরো বাংলাদেশের জন্য নয়, আমাদের এসব মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সবার জন্য রিসোর্স সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।'

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আমরা শপথ নিয়েছিলাম, যতদিন এই প্রতিষ্ঠান না দাঁড়াচ্ছে, আমরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরবো না, যেভাবেই পারি এই প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাবই।'

শুভ উদ্বোধন সিএইচডিআরভি, রংপুর

রংপুরের আলহাজনগর মোল্লা পাড়ায় গত ১৮ অক্টোবর বুরো বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করা হয়। কর্মীদের কর্মদক্ষতা উন্নয়নের কাজে এই মানবসম্পদ কেন্দ্রটির ব্যবহার করা হবে।

বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন এবং প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম যৌথভাবে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেন। এ সময় বুরো বাংলাদেশের স্থানীয় কর্মীসহ রংপুরের বিভিন্ন এনজিও ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, ‘একসময় আমরা দারিদ্র্য নিরসনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখতাম, এখন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন হতে দেখছি।’

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘আমরা আমাদের নিজেদের অবকাঠামোতে বিশ্বমানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারছি।’

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘নির্বাহী পরিচালক জাকির ভাইয়ের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে কিছুটা হলেও ধারণ করতে পেরেছি বলেই বুরো বাংলাদেশ আজ এই পর্যন্ত আসতে পেরেছে।’

শুভ উদ্বোধন সিএইচআরডি, বগুড়া

গত ২৫ নভেম্বর বগুড়ার শাহজাহানপুরে বুরো বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। দশ তলাবিশিষ্ট ভবনটি উদ্বোধন করেন বুরো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন, প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন ও প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম। তিন প্রতিষ্ঠাতার সাথে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন পরিচালক-ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জনাব প্রাণেশ চন্দ্র বণিক, পরিচালক-অপারেশনস ফারমিনা হোসেনসহ বুরো বাংলাদেশের সব সহকারী পরিচালক, স্থানীয় কর্মী এবং বগুড়া শহরের বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা টিএমএসএসের প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর ড. হোসনে আরা বেগম।

উদ্বোধনী ভাষণে মানবসম্পদ কেন্দ্রটির নির্মাণে সম্পৃক্ত সব শ্রমিক ও সংস্থার কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নির্বাহী পরিচালক জাকির হোসেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোরও ব্যাপক অবদান রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে দক্ষ জনশক্তি তৈরির প্রয়োজনেই বুরো বাংলাদেশ বিভিন্ন স্থানে আন্তর্জাতিক মানের মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করছে।'

বিশেষ অতিথি টিএমএসএসের নির্বাহী পরিচালক ড. হোসনে আরা বেগম বলেন, 'এনজিওদের সমন্বয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের অবহেলিত ও দরিদ্র মানুষের হাতে অর্থ যাচ্ছে, জ্ঞান যাচ্ছে, দিক- নির্দেশনা যাচ্ছে এবং এতে তারা সাহস পাচ্ছে। তবে এনজিও হিসেবে অনেক বাধা-বিপত্তি আমাদের পেরোতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সংগঠনকে ঠিক রেখেছি যেন মানুষের জন্য কার্যকরী এবং টেকসই কিছু করতে পারি।'

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বগুড়ার মানুষের জন্য এটি তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-অর্থ এম মোশাররফ হোসেন। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক-বিশেষ কর্মসূচি মো. সিরাজুল ইসলাম বলেন, বুরো বাংলাদেশ টাঙ্গাইল থেকে প্রতিষ্ঠা পেলেও এটি শুধু টাঙ্গাইলের সম্পদ না, এটি পুরো বাংলাদেশের সম্পদ।

বুরোর ট্যাক্স সম্মাননা-২০২৩ প্রাপ্তি

জাতীয় ট্যাক্স কার্ড নীতিমালা, ২০১০ (সংশোধিত)-এর বিধান অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় আদেশক্রমে ১৪১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২০২২-২৩ করবর্ষের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ট্যাক্স কার্ড ও সম্মাননা প্রদান করে। এনজিও/এমএফআই ক্যাটাগরিতে বুরো বাংলাদেশকে ২০২২-২৩ করবর্ষে অন্যতম সেরা করদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ট্যাক্স কার্ড (অ্যাওয়ার্ড) এবং সম্মাননা প্রদান করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বুরো বাংলাদেশের পক্ষে সম্মাননা এবং ট্যাক্স কার্ড গ্রহণ করেন পরিচালক (অর্থ) মো. মোশাররফ হোসেন।

শুভ বড়দিন ও নববর্ষ উদযাপন

বুরো বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ে শুভ বড়দিন ২০২৩ এবং খ্রিস্টিয় নববর্ষ ২০২৪ উদযাপিত হয়েছে। আনন্দঘন এই আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী কর্মীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে কেক কাটার পাশাপাশি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পরিবেশিত শ্রুতিমধুর কীর্তন পুরো আয়োজনকে উৎসবমুখর করে তোলে। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে আয়োজন করা হয় সংক্ষিপ্ত সংগীতানুষ্ঠান। প্রধান কার্যালয়ের কর্মী সবুজ মাজির গাওয়া বাংলা ও গারো ভাষার গানে মুগ্ধতা ছড়িয়ে পরে উপস্থিত সবার মাঝে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই অংশ নেন গান ও নাচে। এই পুরো আয়োজনের শুরু থেকেই উপস্থিত ছিলেন সংস্থার পরিচালক অপারেশনস- ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, আইসিটি ও এইচআরডি ফারমিনা হোসেন। সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের হাতে বড়দিনের উপহার তুলে দেন যা অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে। এবারের আয়োজনে সান্তা ক্লজের ভূমিকায় ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের কর্মী সুনির্মল চিসাম। তিনি নির্বাহী পরিচালকসহ অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ও প্রধান কার্যালয়ের সব কর্মীদের মাঝে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছাস্বরূপ চকলেট বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আনন্দময় জীবন কামনা করেন।

আইসিটি ও ডিএফএস বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা সভা

গত ১৯-২০ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বুরো বাংলাদেশের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগের বার্ষিক পরিকল্পনা ও ডিজিটাল সিনার্জি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুরো বাংলাদেশের বগুড়া মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী বার্ষিক পরিকল্পনা সভাটি আয়োজিত হয়। সংস্থার আইসিটি বিভাগ, ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও কমিউনিকেশন্স অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া টিমে কর্মরত মোট ১২৭ জন কর্মী এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাটি পরিচালনা করেন পরিচালক- অপারেশনস, ফারমিনা হোসেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এসব কর্মীরা সভায় যথাযথ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে একযোগে অংশ নেন। সংস্থার কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী ভাবনা, প্রস্তাব ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সব কর্মীকে তাদের মতামত প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করা হয়। এ সময় আধুনিক প্রযুক্তি ও গ্রাহক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সংস্থার সেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা পেশ করেন আইসিটি বিভাগ, ডিএফএস ও কমিউনিকেশন্স টিমের প্রতিনিধিরা। উক্ত আয়োজনে যোগদান করে বার্ষিক পরিকল্পনা সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করায় সংস্থার পরিচালক- অপারেশনস ফারমিনা হোসেন সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আলোকচিত্র ● বিদ্যুত খোশনবীশ

ডিজিটাল যাত্রা

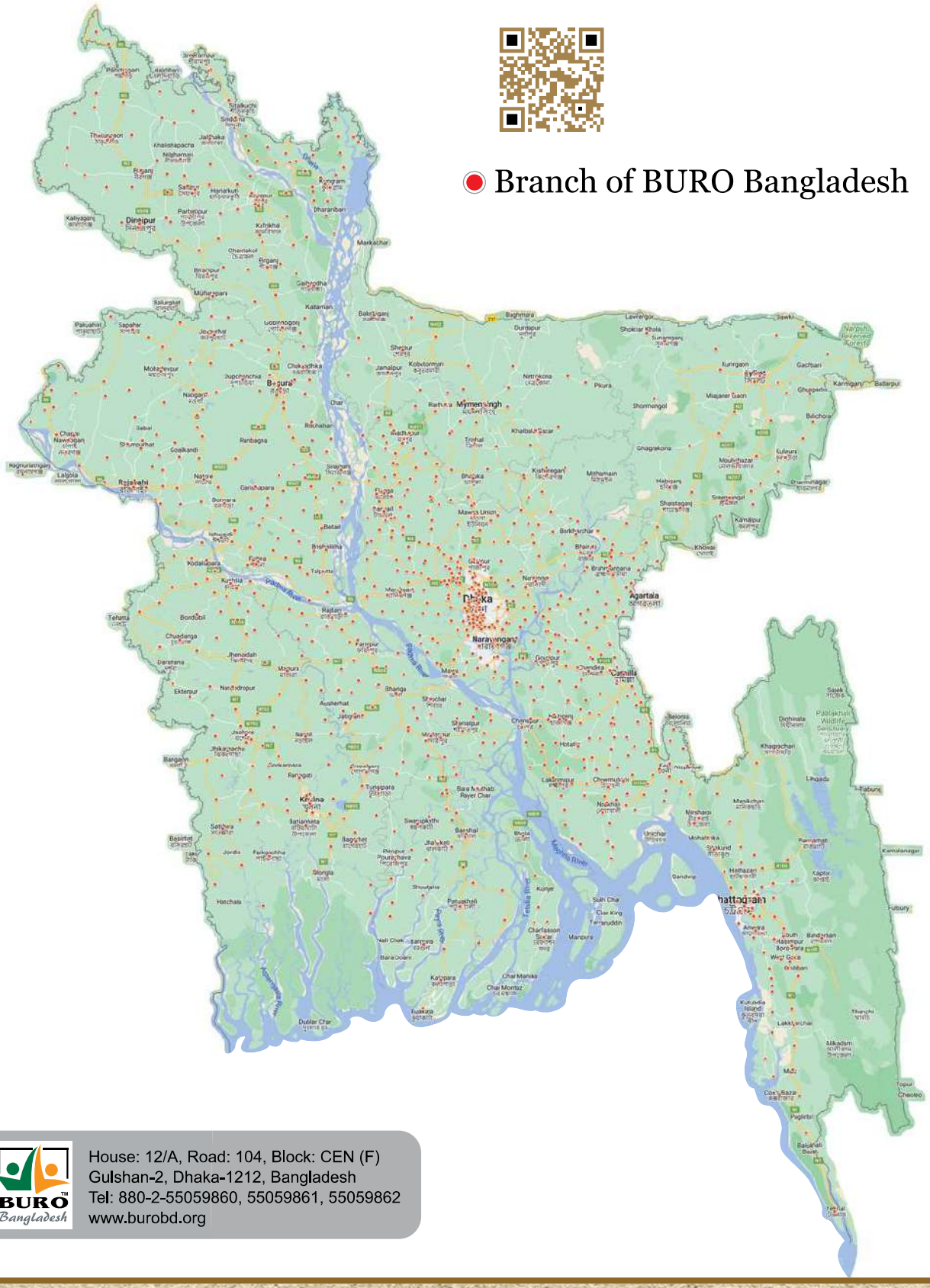

BURO Bangladesh
House: 12/A, Road: 104, Block: CEN (F)
Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh
Tel: 880-2-55059860, 55059861, 55059862
www.burobd.org